অনুঘটক

অনেক সময় দেখা যায় কোনো রাসায়নিক পরিবর্তন খুবই ধীরে ধীরে ঘটছে। অথচ সেই মিশ্রণে সামান্য পরিমাণে অন্য একটি পদার্থ মেশাবার পর বিক্রিয়া ঘটছে খুব তাড়াতাড়ি। যেসব পদার্থ রাসায়নিক বিক্রিয়ার বেগ বাড়ায় তাদের বলে অনুঘটক বা ক্যাটালিস্ট (Catalyst)। অনুঘটকের কাজকে বলে অনুঘটন বা ক্যাটালিসিস (Catalysis)। হাইড্রোজেন পারক্সাইড (H_2O_2) হলো একটি বর্ণহীন তরল। এটি খুব সুস্থিত নয়। সাধারণ তাপমাত্রায় খুব ধীরে ধীরে ভেঙে যায়, আর জল ও অক্সিজেন গ্যাস তৈরি করে :

$$2H_2O_2 \longrightarrow 2H_2O + O_2$$

আমরা এই ধীর বিক্রিয়াটির উপর অনুঘটকের প্রভাব লক্ষ করব।

পরীক্ষা করো : তোমাদের চাই দুটো টেস্টটিউব, পাতলা হাইড্রোজেন পারক্সাইড দ্রবণ, সামান্য ম্যাঙ্গানিজ ডাইঅক্সাইড (MnO_2) গুঁড়ো আর খানিকটা জল।

পরীক্ষা	কী দেখবে	কী বুঝবে
একটা টেস্টটিউবে অল্প হাইড্রোজেন পারক্সাইড দ্রবণে সমপরিমাণ জল মিশিয়ে রেখে দেওয়া হলো	বুদবুদ বেরোবার হার খুবই কম	মিশ্রণে MnO_2 থাকলে রাসায়নিক বিক্রিয়ার বেগ বেড়ে যায়। অতএব (MnO_2) এখানে অনুঘটক হিসেবে কাজ করছে। বিক্রিয়ার সমীকরণ :
অন্য টেস্টটিউবে অল্প হাইড্রোজেন পারক্সাইড দ্রবণে সমপরিমাণ জল মিশিয়ে খুব সামান্য MnO_2 গুঁড়ো দেওয়া হলো	দ্রুত অক্সিজেনের বুদবুদ বেরোতে থাকে	$2H_2O_2 \xrightarrow{MnO_2} 2H_2O + O_2$

সাবধানতা : হাইড্রোজেন পারক্সাইড দ্রবণ চোখ ও চামড়ার পক্ষে ক্ষতিকারক। নিজেরা এই পরীক্ষা না করে শিক্ষক/শিক্ষিকার তত্ত্বাবধানে দেখে বোঝার চেষ্টা করা উচিত। ম্যাঙ্গানিজ ডাইঅক্সাইডের (MnO_2) গুঁড়ো যেন চোখে বা নাকে না ঢোকে সে বিষয়ে সাবধান হতে হবে।

অনুঘটকের বৈশিষ্ট্য

(1) অনুঘটক রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে, কিন্তু বিক্রিয়া শেষে আবার তাকে ফিরে পাওয়া যায়।
(2) এমন কোনো অনুঘটক হয় না যা সব বিক্রিয়ার বেগ বাড়াতে পারবে।
(3) কোনো বিক্রিয়ায় কোন অনুঘটক উপযোগী হবে তা পরীক্ষা করে বার করতে হয়, বিক্রিয়ার সমীকরণ দেখেই বলা যায় না।

রাসায়নিক শিল্পে নানান প্রয়োজনীয় যৌগ (অ্যামোনিয়া, নাইট্রিক অ্যাসিড, সালফিউরিক অ্যাসিড ইত্যাদি) তৈরি করতে বিভিন্ন অনুঘটক অপরিহার্য।

● দুটো একই রকমের চক নাও। একটাকে ভেঙে টুকরো করো, অন্যটা থাকুক পাশাপাশি। কী দেখবে?

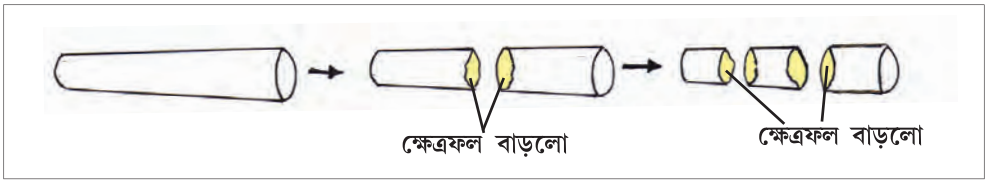

দেখতেই পাচ্ছ বড়ো টুকরোকে ভেঙে ফেললে ক্ষেত্রফল কীভাবে বাড়ে। তোমরা নিশ্চয়ই দেখেছ কয়লার বড়ো টুকরোর চেয়ে সমান ওজনের ছোটো ছোটো টুকরো বেশি তাড়াতাড়ি পোড়ে। এর কারণ হলো কঠিনের উপরিতলে যত বেশি সংখ্যক অণু, পরমাণু বা আয়ন বিক্রিয়ার সুযোগ পায় বিক্রিয়া ঘটে তত তাড়াতাড়ি।

● ওপরে হাইড্রোজেন পারক্সাইডে MnO_2 গুঁড়ো দেওয়ার যে পরীক্ষার কথা পড়লে সেখানে MnO_2-র বড়ো ডেলা, না সমান ভরের সূক্ষ্ম গুঁড়ো — কোনটা দিলে বেশি তাড়াতাড়ি অক্সিজেনের বুদবুদ বেরোবে?

সূক্ষ্ম গুঁড়ো; কারণ গুঁড়ো করলে অনুঘটকের ক্ষেত্রফল বাড়ে, অনুঘটকের কাজও ঘটে তাড়াতাড়ি। তাই রাসায়নিক কারখানায় কঠিন অনুঘটক ব্যবহার করলে তা সূক্ষ্ম গুঁড়ো বা, সরু তারজালি আকারে রাখা হয়।

● **নীচের ঘটনাগুলোর মধ্যে কী মিল আছে আবিষ্কার করার চেষ্টা করো**

(1) বাড়িতে ধুনো দেবার সময় বড়ো টুকরোর চেয়ে সমান ওজনের গুঁড়ো ধুনো তাড়াতাড়ি জ্বলে ওঠে। (2) বড়ো টুকরোর চেয়ে গুঁড়ো মশলা অপেক্ষাকৃত কম সময়ে রান্নায় সুগন্ধ আনে। আস্ত আলুর চেয়ে ছোটো টুকরো সেদ্ধ হতে কম সময় লাগে। (3) বড়ো দানার চিনির চেয়ে গুঁড়ো চিনি জলে তাড়াতাড়ি গোলে।

জৈব অনুঘটক : উৎসেচক বা এনজাইম (Enzyme)

বিশেষ বিশেষ ধরনের জৈব অনুঘটক বা এনজাইম না থাকলে জীবকোশে বেশিরভাগ রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটতে পারত না। এই জৈব অনুঘটকগুলো প্রধানত প্রোটিনজাতীয় যৌগ। তুমি কী এদের কাজ দেখতে চাও? তাহলে তোমার লাগবে পাতলা হাইড্রোজেন পারক্সাইড দ্রবণ, কিছু সদ্য কাটা আলুর টুকরো, দুটো টেস্টটিউব আর খানিকটা জল।

পরীক্ষা	কী দেখবে	কী বুঝতে পারবে
একটা টেস্টটিউবে হাইড্রোজেন পারক্সাইড দ্রবণে সমপরিমাণ জল মিশিয়ে রাখা হলো	অক্সিজেনের বুদবুদ বেরোবার হার খুবই কম	বিক্রিয়ার হার খুবই কম।
অন্য টেস্টটিউবে পাতলা হাইড্রোজেন পারক্সাইড দ্রবণে অল্প জল দিয়ে তাতে একটা সদ্য কাটা আলুর টুকরো দেওয়া হলো	তাড়াতাড়ি বুদবুদ বেরোতে শুরু করেছে	আলুর ক্যাটালেজ (catalase) এনজাইম হাইড্রোজেন পারক্সাইডকে ভেঙে অক্সিজেন গ্যাস দিয়েছে। $2H_2O_2 \longrightarrow 2H_2O + O_2$

মেটে বা লিভারেও ক্যাটালেজ এনজাইম থাকে, তা নিয়েও এই পরীক্ষা করে দেখা সম্ভব।

● আরো একটা এনজাইমের কাজ দেখতে চাও? তাহলে একটু জল, ইউরিয়া, অড়হর ডালের গুঁড়ো বা তরমুজের বীজের মধ্যের সাদা অংশ আর একটু ফেনলথ্যালিন দ্রবণ লাগবে।

কাঁচের গ্লাসে সামান্য জলে খানিকটা ইউরিয়া গুলে এক চামচ অড়হর ডালের গুঁড়ো দিয়ে মিনিট দশেক ভিজিয়ে রাখো। সাবধানে শুঁকলে অ্যামোনিয়ার গন্ধ পাবে, ফেনলথ্যালিন দিলে দ্রবণ গোলাপি হয়ে যাবে। কেন এমন হয়? অড়হর ডাল বা তরমুজের বীজে ইউরিয়েজ (urease) বলে একরকম এনজাইম থাকে। ইউরিয়েজ ইউরিয়ার সঙ্গে জলের বিক্রিয়া ঘটিয়ে অ্যামোনিয়া তৈরি করে [$CO(NH_2)_2 + H_2O \rightarrow CO_2 + 2NH_3$] অ্যামোনিয়া দ্রবণকে ক্ষারীয় করে দিচ্ছে। তাই ফেনলথ্যালিন গোলাপি হয়ে যাচ্ছে।

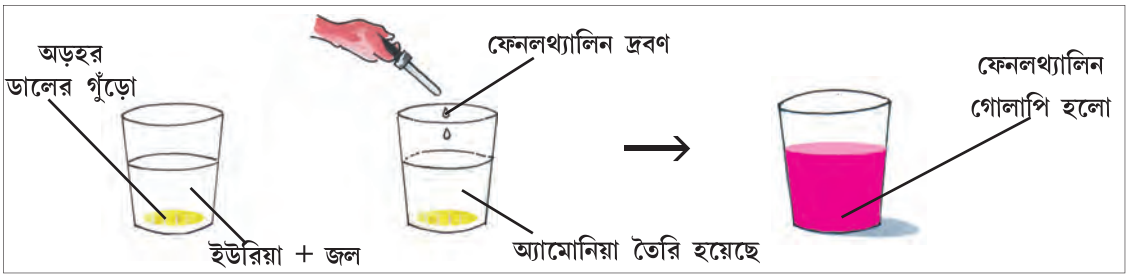

প্রস্রাবাগারের ঝাঁঝালো গন্ধ অ্যামোনিয়ার। নর্দমার জীবাণুরা প্রস্রাবের ইউরিয়া ভেঙে অ্যামোনিয়া দেয়।

খাবারের বিভিন্ন উপাদান — প্রোটিন, শর্করা, লিপিড — হজম করতে নানান এনজাইম অপরিহার্য। তোমার দেহে খাদ্য থেকে শক্তি তৈরিতে, নতুন নতুন প্রোটিন তৈরি করতে, ডিএনএ তৈরিতে, হরমোন, কোশপর্দার নানান প্রয়োজনীয় লিপিড তৈরিতে, কোশের মধ্যে ক্ষতিকারক যৌগকে নষ্ট করতে কতরকমের এনজাইম লাগে। এনজাইম ছাড়া কোনো কোশই বাঁচতে পারবে না।

পদ্যে আর ছবিতে এনজাইমদের কিছু কাজের কথা বলা হলো। দেখোতো বুঝতে পারো কিনা।

কেউ বা জোড়ে ছোট্ট অণু,
কেউ বা ভাঙে বড়ো;
ইলেকট্রনের আদান-প্রদান,
কেউ সে কাজে দড়ো।

কেউ বা জোড়ে ছোট্ট অণু

কোথাও চলে লিপিড গড়া,
কোথাও ভাঙে প্রোটিন—
এনজাইমেই করছে সেকাজ,
নইলে ভারি কঠিন।

কেউ বা ভাঙে বড়ো

তাপগ্রাহী ও তাপমোচী পরিবর্তন

তাপমোচী পরিবর্তন

যেসব রাসায়নিক পরিবর্তনে তাপ উৎপন্ন হয় তাদের বলে তাপমোচী রাসায়নিক পরিবর্তন (exothermic reaction)। তোমরা কী কী তাপমোচী রাসায়নিক বিক্রিয়ার কথা জানো ভেবে বলো তো:

1. কয়লা পোড়ানো 2. ———————— 3. পোড়াচুনে জল দেওয়া 4 . ————

যে-কোনো জ্বালানির দহন তাপমোচী পরিবর্তন। নীচে কিছু তাপমোচী বিক্রিয়ার উদাহরণ দেওয়া হলো। এখানে সমীকরণের ডানদিকে '(+) তাপ' মানে বুঝতে হবে বিক্রিয়া ঘটলে তাপ মুক্ত হচ্ছে।

কার্বনের দহন : $C + O_2 \rightarrow CO_2 +$ তাপ

পোড়াচুন ও জলের বিক্রিয়া : $CaO + H_2O \rightarrow Ca(OH)_2 +$ তাপ

মিথেন গ্যাসের দহন : $CH_4 + 2O_2 \rightarrow CO_2 + 2H_2O +$ তাপ

রাসায়নিক বিক্রিয়ায় তাপ মুক্ত হওয়ার সময় কখনো-কখনো আলোও উৎপন্ন হতে পারে। গ্যাস, কয়লা, কাঠ, কেরোসিন, মোম এসব পোড়ালে তাপ ও আলো দুইই পাওয়া যায়।

তাপমোচী রাসায়নিক বিক্রিয়ার ব্যবহারিক প্রয়োগ

রান্না করতে রোজই আমরা কোনো না কোনো জ্বালানি পোড়াই। তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে কয়লা বা গ্যাস পুড়িয়ে যে তাপশক্তি পাওয়া যায় তা দিয়ে জল ফুটিয়ে স্টিম তৈরি করা হয়। বেশি চাপের এই গরম স্টিম যখন ধাক্কা দিয়ে টারবাইনের পাখা ঘোরায় তখন বিদ্যুৎ তৈরি হয়। তোমরা যে ওয়েলডিং বা ধাতু ঝালাই করতে দেখো সেও একরকমের তাপমোচী রাসায়নিক বিক্রিয়ার প্রয়োগ। এখানে অ্যাসিটিলিন (C_2H_2) গ্যাসকে পুড়িয়ে তাপ পাওয়া যায় এবং এত বেশি উষ্ণতা সৃষ্টি হয় যে লোহা গলে যায়।

ওয়েলডিং

সতর্কতা : যেসব তাপমোচী রাসায়নিক পরিবর্তনে দ্রুত বিক্রিয়া ঘটে প্রচুর পরিমাণে গ্যাস তৈরি হয় সেগুলো খুব বিপজ্জনক। যে-কোনো বিস্ফোরকের বিস্ফোরণে প্রচুর তাপ ও প্রচুর পরিমাণে বিভিন্ন গ্যাস মুক্ত হয়। গরম গ্যাস দ্রুত ছড়িয়ে পড়ার সময় যে তরঙ্গ সৃষ্টি হয় তার ধাক্কায় ক্ষয়ক্ষতি হয়।

তাপগ্রাহী পরিবর্তন

যেসব রাসায়নিক পরিবর্তনে বিক্রিয়া ঘটলে পরিবেশ থেকে তাপ শোষিত হয় তাদের বলে তাপগ্রাহী পরিবর্তন (endothermic reaction)। নীচে কয়েকটি তাপগ্রাহী বিক্রিয়ার উদাহরণ দেওয়া হলো: এখানে সমীকরণের ডানদিকে '(-) তাপ' মানে বুঝতে হবে বিক্রিয়া ঘটলে পরিবেশ থেকে তাপ শোষিত হচ্ছে। তাপগ্রাহী একটা বিক্রিয়ার উদাহরণ হলো কঠিন বেরিয়াম হাইড্রক্সাইডের জলযুক্ত ক্রিস্টাল ($Ba(OH)_2.8H_2O$) ও কঠিন অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইডের (NH_4Cl) বিক্রিয়া। এই দুটো কঠিনকে একটা

বিকারে রেখে মেশালে দ্রুত বিক্রিয়া ঘটে এবং একটা কাদাকাদা মিশ্রণ উৎপন্ন হয়। বিক্রিয়ার সমীকরণ

$$\underset{\text{কঠিন}}{Ba(OH)_2.8H_2O} + \underset{\text{কঠিন}}{2NH_4Cl} \rightarrow \underset{\text{কঠিন}}{BaCl_2 . 2H_2O} + \underset{\text{(দ্রবণ)}}{2NH_3} + \underset{\text{(তরল)}}{8\ H_2O} - \text{তাপ}$$

এটা এতই তাপগ্রাহী পরিবর্তন যে বিকারের বাইরে জলের ফোঁটা থাকলে তা জমে বরফ হয়ে যায়। এই পরীক্ষায় অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইডের বদলে অ্যামোনিয়াম নাইট্রেটও ব্যবহার করা যেতে পারে।

চুনাপাথর ($CaCO_3$) থেকে পোড়াচুন (CaO) তৈরিও একটি তাপগ্রাহী পরিবর্তন :

$$CaCO_3 \xrightarrow{1000^\circ C} CaO + CO_2 - \text{তাপ}$$

- ভৌত পরিবর্তনও তাপগ্রাহী বা তাপমোচী হতে পারে। তোমার প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতা থেকে তিনটি তাপগ্রাহী ভৌত পরিবর্তনের কথা উল্লেখ করো।
- জলে অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড (NH_4Cl) দ্রবীভূত হবার মিনিট দুয়েকের মধ্যে দেখা গেল টেস্ট টিউবের বাইরের গায়ে ফোঁটা ফোঁটা জল জমেছে। দ্রবীভূত হওয়া কী ধরনের পরিবর্তন? এই দ্রবণে থার্মোমিটার ডোবালে কী দেখতে পেতে?
- একটি পরিবর্তন যে রাসায়নিক পরিবর্তন তা বুঝবে কী করে?

যদি পরিবর্তনটির সময় (a) কোনো অধঃক্ষেপ পড়ে বা, (b) গ্যাস নির্গত হয় বা, (c) রঙের পরিবর্তন হয় এবং (d) তাপ মুক্ত বা শোষিত হয়, তাহলে প্রাথমিকভাবে মনে করা যেতে পারে সেটি রাসায়নিক পরিবর্তন।

- পোড়াচুনে (CaO) জল দিলে কলিচুন তৈরি হওয়া ছাড়াও প্রচুর স্টিম (উত্তপ্ত জলীয় বাষ্প) নির্গত হয়। কেন এমন হয় ব্যাখ্যা করো।
- চাপে রাখা অক্সিজেন ও অ্যাসিটিলিন গ্যাসের উচ্চ গতিতে নির্গত মিশ্রণের দহনে ঝালাই করার সময় আলোকশক্তি আসে কোথা থেকে?

ঝালাইয়ের সময় তাপ ও আলোকশক্তি আসে তাপমোচী রাসায়নিক বিক্রিয়া থেকে :

$$2C_2H_2 + 5O_2 \rightarrow 4CO_2 + 2H_2O + \text{তাপ}$$

এতে প্রায় দু-হাজার ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড পর্যন্ত উষ্ণতা সৃষ্টি হতে পারে। এত উষ্ণতায় যে আলো উৎপন্ন হয় তাতে খানিকটা অতিবেগুনি রশ্মিও থেকে যায়। অতিবেগুনি রশ্মি চোখের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকারক। তাই যাঁরা ওয়েলডিং করেন তাঁদের বিশেষ ধরনের ফিল্টার লাগানো চশমা পরে কাজ করতে হয়।

রাসায়নিক বিক্রিয়ার সময় কিছু রাসায়নিক বন্ধন ভাঙে এবং নতুন বন্ধন গঠিত হয়; কোথাও আয়নীয় যৌগ গঠিত হয়, কোথাও আয়নীয় যৌগের কেলাস ভেঙে নতুন পদার্থ উৎপন্ন হয়; কোথাও আবার আয়নদের বিক্রিয়ায় নতুন পদার্থ গঠিত হয়। সাধারণভাবে বললে বলা যায় যে এইসব ভাঙা-গড়ার সামগ্রিক ফলাফলরূপে কোথাও তাপ মুক্ত হয় (তাপমোচী বিক্রিয়া) আবার কোথাও তাপ শোষিত হয় (তাপগ্রাহী বিক্রিয়া)।

জারণ-বিজারণের ধারণা

আমাদের প্রতিদিনের অভিজ্ঞতা থেকেই আমরা জানি যে কাঠ, কয়লা ইত্যাদিতে খোলা বাতাসে আগুন দিলে তাপ ও আলো উৎপন্ন হয়। মোমবাতি, কেরোসিন তেল, রান্নার গ্যাসও খোলা বাতাসে একইভাবে জ্বলে তাপ ও আলো উৎপন্ন করে। এই ঘটনাকে আমরা বিজ্ঞানের ভাষায় দহন বলে থাকি। ওপরে যেসব পদার্থের দহনের উদাহরণ দেওয়া হলো, তাদের দহনের ফলে কী হয়?

মোম, কেরোসিন তেল ও রান্নার গ্যাসের মূল উপাদান হলো কার্বন ও হাইড্রোজেন। দহনের সময়ে বাতাসের অক্সিজেন এই দুটো মৌলের সঙ্গে যুক্ত হয়ে কার্বন ডাইঅক্সাইড ও জল (জলীয় বাষ্প) উৎপন্ন করে।

জ্বালানির জৈব অণুতে থাকা কার্বন + O_2 $\rightarrow$ CO_2

জ্বালানির জৈব অণুতে থাকা হাইড্রোজেন + O_2 $\rightarrow$ H_2O (জলীয় বাষ্প)

নীচের পরীক্ষার বর্ণনা থেকে ঘটনাগুলো ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করো :

একটা প্রজ্জ্বলন (দহন) চামচে একটুকরো কাঠকয়লা (মূলত কার্বন) রেখে তাতে আগুন ধরিয়ে লাল হওয়া পর্যন্ত গরম করা হলো। তারপর একটা অক্সিজেনপূর্ণ গ্যাসজারে পাশের ছবির মতো করে ঢুকিয়ে রাখলে দেখা যাবে কাঠকয়লা পুড়ে ছাই উৎপন্ন হয়েছে। দহনে উৎপন্ন গ্যাসকে স্বচ্ছ চুনজলের মধ্যে পাঠালে দেখা যাবে স্বচ্ছ চুনজল ঘোলা হয়ে গেল। নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে ও শিক্ষক/শিক্ষিকার সাহায্যে নীচের সারণি পূরণ করো।

কী করলে	কী দেখলে ও তার কারণ	কী সিদ্ধান্ত নিতে পারো
লাল হয়ে ওঠা কাঠকয়লার টুকরো অক্সিজেনপূর্ণ গ্যাসজারে প্রবেশ করানো হলো	কাঠকয়লা পুড়ে ছাই হলো কারণ কাঠকয়লা (কার্বন) দাহ্য পদার্থ	
ঠান্ডা করা জারের মধ্যে স্বচ্ছ চুনজল ঢেলে ঝাঁকানো হলো	স্বচ্ছ চুনজল ঘোলা হয়ে গেল। কারণ CO_2 স্বচ্ছ চুনজলকে ঘোলা করে।	

এক্ষেত্রে কাঠকয়লার (কার্বন) দহন ঘটে কার্বন ডাইঅক্সাইড (CO_2) উৎপন্ন হয়েছে, যা স্বচ্ছ চুনজলকে ঘোলা করে। তাই কার্বন ও অক্সিজেন যুক্ত হয়েই এই কার্বন ডাইঅক্সাইড উৎপন্ন হয়েছে।

একটা টিনের কৌটোর ঢাকনির সঙ্গে একটু মোটা ও কিছুটা লম্বা একটা তার পেঁচিয়ে জুড়ে নাও। ছবির মতো করে বাঁকিয়ে নিলেই তৈরি হয়ে গেল তোমার নিজের তৈরি প্রজ্জ্বলন চামচ।

একইভাবে দহন চামচে হলুদ রং-এর সালফার গুঁড়ো নিয়ে পোড়ালে ঝাঁঝালো গন্ধযুক্ত সালফার ডাইঅক্সাইড পাওয়া যায়। আবার ম্যাগনেশিয়াম ধাতুর ফিতে আগুনে পোড়ালে ম্যাগনেশিয়াম অক্সাইডের সাদা গুঁড়ো উৎপন্ন হয়। এই দুটো বিক্রিয়ার রাসায়নিক সমীকরণ যথাক্রমে

$S + O_2 \rightarrow SO_2$ $\qquad\qquad$ $2Mg + O_2 \rightarrow 2MgO$

আবার যদি কোনো বড়ো বনের শুকনো গাছে গাছে ঘষা লেগে দাবানল সৃষ্টি হয় তবে গাছের দেহে থাকা নানা উপাদান পুড়ে CO_2, জলীয় বাষ্প ও অন্যান্য গ্যাস উৎপন্ন হয়ে পরিবেশে ছড়িয়ে পড়ে। কয়লা বা কাঠ পোড়ানোর সময় CO, CO_2, জলীয় বাষ্প ছাড়াও অন্যান্য গ্যাস যথা SO_2, N_2 ইত্যাদি উৎপন্ন হয়। এইসময় বিক্রিয়ায় কোনো যৌগের বা বিভিন্ন যৌগের মিশ্রণের সঙ্গে অক্সিজেনের বিক্রিয়া হয়।

এগুলোকে জারণ (Oxidation) বলা হয়।

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে অনেক ধাতু বা অধাতু অক্সিজেনের সঙ্গে দহন প্রক্রিয়ায় যুক্ত হয়ে অক্সাইড যৌগে পরিণত হয়। কোনো মৌলের সঙ্গে অক্সিজেন যুক্ত হবার বিক্রিয়াকেই আমরা জারণ বলে থাকি। দহনও এক ধরনের জারণ বিক্রিয়া—তা প্রাকৃতিকভাবেও হতে পারে, আবার মনুষ্যসৃষ্টও হতে পারে।

বিভিন্ন ধাতু যে সমস্ত আকরিক থেকে বিভিন্ন রাসায়নিক পদ্ধতিতে বের করা হয়, সেই আকরিকগুলোর অনেকগুলোই ওই সমস্ত ধাতুর অক্সাইড যৌগ। এই সমস্ত অক্সাইড যৌগ পৃথিবীতে অক্সিজেন গ্যাস উৎপত্তির পরেই হয়তো উৎপন্ন হয়েছিল। তাহলে দেখো জারণ বিক্রিয়া একটা খুবই সাধারণ ও স্বাভাবিক বিক্রিয়া। জীবদেহেও খাবারের সরলতম উপাদান শ্বসন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে জারিত হয়ে শক্তি উৎপন্ন করে।

খোলা বাতাসে লোহা পড়ে থাকলে তার গায়ে একটা লালচে বাদামি আস্তরণ পড়ে যায়। একে আমরা মরচে বলি। লোহার মরচে পড়া একটা রাসায়নিক বিক্রিয়া। একটা সাধারণ পরীক্ষা করে দেখো, মরচে পড়ার জন্য কী কী পদার্থের উপস্থিতি একান্তভাবেই প্রয়োজন।

হাতেকলমে

তিনটি কাচের গ্লাসের প্রথমটায় কয়েকটা চকচকে লোহার পেরেক খোলা বাতাসে রেখে দাও। দ্বিতীয় গ্লাসে সাধারণ জল এমনভাবে ঢালো যাতে পেরেকগুলো জলে ডুবে থাকে। অন্য একটা পাত্রে বেশ কিছুক্ষণ ধরে জল নিয়ে ফোটাও। তারপর সেই ফোটানো জল তৃতীয় গ্লাসটায় একইভাবে ঢালো। এবার মোম গলিয়ে দ্বিতীয় ও তৃতীয় গ্লাসের জলের ওপর ঢেলে এমন একটা স্তর তৈরি করো যাতে কোথাও ফাঁক না থাকে।

কয়েকদিন পর তিনটে গ্লাসের মধ্যে লোহার পেরেকের কেমন পরিবর্তন লক্ষ করছ তা লেখো।

কোন গ্লাসে	কেমনভাবে পেরেক আছে	কী পরিবর্তন ঘটতে দেখছ
প্রথম গ্লাসে		
দ্বিতীয় গ্লাসে		
তৃতীয় গ্লাসে		

তৃতীয় গ্লাসে জল ঢালার আগে জলটাকে বেশ কিছুক্ষণ ফোটানো হয়েছিল। জলের মধ্যে বেশ কিছুটা অক্সিজেন গুলে থাকে এটা তো আমরা জানি (এই অক্সিজেনই জলজ উদ্ভিদ বা জলে বসবাসকারী প্রাণীদের বাঁচতে সাহায্য করে)। কিন্তু জল ফোটাবার ফলে কী হলো?

যেহেতু ওপরের পরীক্ষায় তৃতীয় গ্লাসের জলের মধ্যে গুলে থাকা অক্সিজেন ছিল না, তাই এই গ্লাসের পেরেকের গায়ে মরচে পড়েনি। ওপরের পরীক্ষা থেকে স্পষ্ট যে, মরচে গঠনের জন্য শুধু লোহা আর জল উপস্থিত থাকলেই হবে না। অক্সিজেনও প্রয়োজন। আবার বিক্রিয়াটাতে জলের প্রয়োজন হলেও তা লোহার সঙ্গে সরাসরি যুক্ত হয়নি। এই বিক্রিয়ায় লোহার সঙ্গে সরাসরি যুক্ত হয়েছে অক্সিজেন।

এরকম বিক্রিয়া যেখানে কোনো মৌল বা যৌগের সঙ্গে অক্সিজেন যুক্ত হয় তাকে জারণ বলা হয়।

- মৌলের সঙ্গে অক্সিজেন যোগ হওয়া : $2Cu + O_2 \rightarrow 2CuO$
  কপার — কিউপ্রিক অক্সাইড
- যৌগের সঙ্গে অক্সিজেন যুক্ত হওয়া : $2CO + O_2 \rightarrow 2CO_2$
  কার্বন মনোক্সাইড — কার্বন ডাইঅক্সাইড

আবার কোনো বিক্রিয়ায় অক্সিজেনের পরিবর্তে ক্লোরিন যুক্ত হওয়াকেও জারণ বলা হয়।

$$2Fe + 3Cl_2 \rightarrow 2FeCl_3$$

আয়রন — ফেরিক ক্লোরাইড

সমস্ত জারণ বিক্রিয়াতেই যে অক্সিজেন বা ক্লোরিনের মতো মৌল যুক্ত হয়েছে তা দেখা যায় না। তাই বিকল্প হিসাবে বলা হয় যদি কোনো পদার্থ থেকে হাইড্রোজেনের অপসারণ ঘটে তবে সেই বিক্রিয়াটিও একটি জারণ বিক্রিয়া। যেমন—ক্লোরিন জলের মধ্যে দিয়ে পচা ডিমের গন্ধবিশিষ্ট হাইড্রোজেন সালফাইড গ্যাস (H_2S) পাঠানো হলে দ্রবণটা ঘোলা হয়ে কিছুটা সালফার থিতিয়ে পড়ে বা অধঃক্ষিপ্ত হয়।

$$H_2S + Cl_2 \rightarrow 2HCl + S\downarrow$$

এই সমীকরণ থেকে স্পষ্ট যে হাইড্রোজেন সালফাইড থেকে হাইড্রোজেন বেরিয়ে গিয়ে সালফার উৎপন্ন হয়েছে। তাই বলা হয় এক্ষেত্রে H_2S-এর জারণ ঘটেছে।

তাহলে জারণের বিপরীত প্রক্রিয়া যাকে বিজারণ বলা হয়, দেখা যাক সেটা কী ধরনের বিক্রিয়া।

কালো রঙের উত্তপ্ত কিউপ্রিক অক্সাইডের ওপর দিয়ে হাইড্রোজেন গ্যাস পাঠালে অবশেষ হিসাবে লালচে বাদামি রঙের ধাতব কপার পাওয়া যায়।

$$CuO + H_2 \rightarrow Cu + H_2O$$

বোঝা যাচ্ছে যে, কিউপ্রিক অক্সাইড থেকে অক্সিজেন বেরিয়ে গিয়ে কপার উৎপন্ন হয়েছে। এরকম বিক্রিয়ায় যাতে কোনো যৌগ থেকে অক্সিজেন অপসারিত হয় তাকে বিজারণ (Reduction) বলা হয়।

বিজারণ বিক্রিয়ায় যে সবসময়েই অক্সিজেনের অপসারণ ঘটবে তা নয়। তাই অন্যভাবে বলা হয় যেসব বিক্রিয়ায় কোনো মৌলের বা যৌগের সঙ্গে হাইড্রোজেন যুক্ত হয় তাদের বিজারণ বিক্রিয়া বলে।

যেমন—লোহাচুর অনুঘটকের উপস্থিতিতে (550°C) উষ্ণতা ও 200 বায়ুমণ্ডলীয় চাপে নাইট্রোজেনের সঙ্গে হাইড্রোজেন যুক্ত হয়ে অ্যামোনিয়া উৎপন্ন হয়।

$$N_2 + 3H_2 \rightarrow 2NH_3$$

এই বিক্রিয়ায় নাইট্রোজেনের বিজারণের ফলে অ্যামোনিয়া উৎপন্ন হয়। পরের পৃষ্ঠায় কয়েকটা বিক্রিয়ার সমীকরণ দেওয়া হলো। ওপরের পদ্ধতিতে কোন পদার্থের জারণ ঘটেছে ও কোন পদার্থের বিজারণ হয়েছে তা চিহ্নিত করো।

বিক্রিয়ার সমীকরণ	কোন পদার্থের জারণ হয়েছে	কোন পদার্থের বিজারণ হয়েছে	কোন যুক্তিতে তুমি জারণ বা বিজারণ বলবে
i) $2SO_2 + O_2 \rightarrow 2SO_3$ ii) $Fe_2O_3 + 3CO \rightarrow 2Fe + 3CO_2$			
iii) $ZnO + C \rightarrow Zn + CO$			
iv) $2FeCl_3 + H_2S \rightarrow 2FeCl_2 + 2HCl + S$			
v) $FeO + H_2 \rightarrow Fe + H_2O$			
vi) $Fe_2O_3 + Al \rightarrow Fe + Al_2O_3$			

এতক্ষণ পর্যন্ত যে সমস্ত বিক্রিয়ার কথা আলোচনা করা হয়েছে সেগুলো ভালো করে লক্ষ করলে দেখা যাবে— যে পদার্থের জারণ ঘটেছে তা অন্য পদার্থকে বিজারিত করেছে। তাই প্রথম পদার্থকে বিজারক বলা হয়। আবার যে পদার্থের বিজারণ ঘটেছে তা অন্য পদার্থকে জারিত করেছে। এরকম পদার্থকে বলা হয় জারক। আরো একটা বিষয় এই আলোচনা থেকে স্পষ্ট হচ্ছে যে, জারণ-বিজারণ বিক্রিয়া সবসময়েই একইসঙ্গে ঘটে। কিন্তু শুধু অক্সিজেন (বা ক্লোরিন) অথবা হাইড্রোজেন সংযোগ বা অপসারণ থেকেই সব জারণ-বিজারণ বিক্রিয়া ব্যাখ্যা করা কি সম্ভব?

হাতেকলমে

একটা ছোটো কাচের গ্লাসে (বা বিকারে) কিছুটা তুঁতের জলীয় দ্রবণ নাও। তার মধ্যে একটা মাঝারি মাপের চকচকে লোহার পেরেক ডুবিয়ে দাও। কিছু পরে কী দেখতে পেলে তা নীচে লেখো।

কী করলে	কী দেখতে পেলে

কিছুক্ষণ পরে তুঁতের দ্রবণে ডোবানো পেরেকটা শুকিয়ে নিয়ে ভালো করে লক্ষ করলে দেখতে পাবে পেরেকের যতটা অংশ তুঁতের দ্রবণে ডোবানো ছিল সেই অংশে কোনো রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটেছে। অন্য পরীক্ষার সাহায্যে প্রমাণ করা যায় লোহার পেরেকের ওপর পড়া লালচে বাদামি আস্তরণটা ধাতব কপারের বা তামার। আবার এও প্রমাণ করা যাবে যে বিক্রিয়ার পরে পাওয়া দ্রবণে ফেরাস আয়ন (Fe^{2+}) উপস্থিত।

আমরা জানি যে ধাতব কপার তৈরি হয় কপার (Cu) পরমাণু দিয়ে, আর লোহা তৈরি হয় লোহার (Fe) পরমাণু দিয়ে। তাহলে দেখা যাক বিক্রিয়ার আগে কী কী ছিল, আর বিক্রিয়ার পরে কী কী পাওয়া গেল।

বিক্রিয়ার আগে	বিক্রিয়ার পরে
(i) দ্রবণে ছিল : কিউপ্রিক আয়ন (Cu^{2+})	(i) পেরেকের ওপর পড়া আস্তরণে আছে : Cu পরমাণু
(ii) লোহার পেরেকে ছিল : Fe পরমাণু	(ii) দ্রবণে তৈরি হয়েছে : ফেরাস আয়ন (Fe^{2+})

তাহলে এখানে কী কী মূল বিক্রিয়া ঘটেছে?

(i) $Cu^{2+} \rightarrow Cu$ আর (ii) $Fe \rightarrow Fe^{2+}$

এই বিক্রিয়া দুটোতেই বাঁদিক ও ডানদিক সংখ্যাগতভাবে Cu বা Fe-এর কোনো তফাত নেই। কিন্তু একটা জিনিস এখনও সমতায় নেই— তা হলো চার্জ বা আধান।

যদি প্রথম বিক্রিয়ার বাঁদিকে 2 টো ইলেকট্রন ও দ্বিতীয় বিক্রিয়ার ডানদিক 2 টো ইলেকট্রন যোগ করা হয় তবেই বিক্রিয়া দুটোর চার্জ বা আধানের সমতা আসবে। অর্থাৎ সমতাযুক্ত সমীকরণ দুটো হলো :

(i) $Cu^{2+} + 2e^- \rightarrow Cu$ এবং (ii) $Fe \rightarrow Fe^{2+} + 2e^-$ (e^- দিয়ে ইলেকট্রন বোঝানো হয়েছে)

মনে রেখো : কোন রাসায়নিক বিক্রিয়াতেই ইলেকট্রন সৃষ্টি বা ধ্বংস হতে পারে না। তাই বিক্রিয়ার আগে ও পরে মোট ইলেকট্রন সংখ্যা বা চার্জ সমান থাকতে হবে। বিক্রিয়ার সমীকরণের উপযুক্ত দিকে '+' চিহ্ন দিয়েই শুধু ইলেকট্রন লেখা হয়।

ওপরের বিক্রিয়া দুটোকে একটু অন্যভাবে বলা যায়— Fe পরমাণু দুটো ইলেকট্রন ছেড়ে দিয়ে ফেরাস আয়ন (Fe^{2+}) উৎপন্ন করেছে, আর কিউপ্রিক আয়ন (Cu^{2+}) দুটো ইলেকট্রন নিয়ে Cu পরমাণুতে পরিণত হয়েছে।

এই ধরনের বিক্রিয়াকেও জারণ-বিজারণ বলা যেতে পারে, যেখানে জারণের অর্থ ইলেকট্রন ত্যাগ ও বিজারণের অর্থ হলো ইলেকট্রন গ্রহণ; তাহলে ওপরের বিক্রিয়ায় জারণ ঘটেছে Fe পরমাণুর এবং বিজারণ ঘটেছে Cu^{2+}-এর।

কিন্তু সব জারণ-বিজারণ বিক্রিয়াতেই সবসময় পরমাণু ও তার থেকে তৈরি হওয়া আয়নের মধ্যেই ইলেকট্রনের দেওয়া-নেওয়া ঘটবে তা নয়। এই ইলেকট্রন আদান-প্রদানের ফলে আরো কী কী ঘটনা ঘটা সম্ভব তার কয়েকটা দেখা যাক।

(a) অপেক্ষাকৃত কম ধনাত্মক আয়ন বা মূলক (ক্যাটায়ন) —এক বা একাধিক ইলেকট্রন ত্যাগ করলে→ অপেক্ষাকৃত বেশি ধনাত্মক আয়ন বা মূলক

যেমন— $Fe^{2+} \rightarrow Fe^{3+} + e^-$ $Sn^{2+} \rightarrow Sn^{4+} + 2e^-$

(b) অপেক্ষাকৃত কম ঋণাত্মক আয়ন বা মূলক (অ্যানায়ন) —এক বা একাধিক ইলেকট্রন গ্রহণ করলে→ অপেক্ষাকৃত বেশি ঋণাত্মক আয়ন বা মূলক

যেমন— $O^- + e^- \rightarrow O^{2-}$ $MnO_4^- + e^- \rightarrow MnO_4^{2-}$

একইভাবে নীচের সারণিতে দেওয়া বিক্রিয়াগুলোতে কী কী ঘটছে তা বলো। কোনটা জারণ আর কোনটা বিজারণ তা লেখো।

বিক্রিয়ার সমীকরণ	কী ঘটছে জারণ না বিজারণ
(i) $Fe^{3+} + e^- \rightarrow Fe^{2+}$ (ii) $Cl^- \rightarrow Cl + e^-$ (iii) $MnO_4^{2-} \rightarrow MnO_4^- + e^-$ (iv) $Cu^{2+} + 2e^- \rightarrow Cu$	

হাতেকলমে

তুঁতের জলীয় দ্রবণে কয়েকটা জিঙ্কের (দস্তার) টুকরো ফেলে দিলে কিছুক্ষণ পর জিঙ্কের টুকরোর রুপোলি বা ধূসর রঙের গায়ে লালচে বাদামি রঙের ছোপ পড়তে দেখা যায়।

এই পরীক্ষায় উৎপন্ন পদার্থের মধ্যে দুটো জিনিস অন্য পরীক্ষার মাধ্যমে প্রমাণ করা যায়:

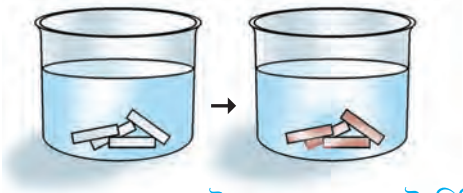

(i) জিঙ্কের ওপর জমা হওয়া আস্তরণটা ধাতব কপারের।

(ii) দ্রবণের মধ্যে জিঙ্ক আয়ন (Zn^{2+}) তৈরি হয়েছে।

ওপরের দুটো তথ্য থেকে এই বিক্রিয়ায় কী কী ঘটতে পারে সে সম্বন্ধে নীচের সারণিতে লেখো। প্রয়োজনে শিক্ষক/শিক্ষিকার সাহায্য নাও।

প্রধান দুটি বিক্রিয়ার সমীকরণ লেখো	কোনটা জারণ ও কোনটা বিজারণ চিহ্নিত করো

একটা কাচের বিকারে বা টেস্টটিউবে সালফিউরিক অ্যাসিডের পাতলা জলীয় দ্রবণ নিয়ে কয়েক টুকরো জিঙ্কের ছিবড়ে ওই দ্রবণের মধ্যে ফেলে দিলে কী দেখা যাবে?

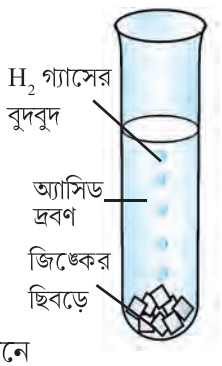

বর্ণহীন, গন্ধহীন একটা গ্যাস জিঙ্কের টুকরোর গা থেকে বুদবুদ আকারে বেরিয়ে আসছে। পরীক্ষা করলে দেখা যাবে এই উৎপন্ন গ্যাসটা হলো হাইড্রোজেন। আবার উৎপন্ন দ্রবণ নিয়ে পরীক্ষা করলে দেখা যাবে তার মধ্যে জিঙ্ক আয়ন (Zn^{2+}) আছে।

এখানে অ্যাসিড দ্রবণে উপস্থিত হাইড্রোজেন আয়ন (H^+) [আসলে হাইড্রক্সোনিয়াম আয়ন (H_3O^+)] থেকেই হাইড্রোজেন গ্যাস H_2 উৎপন্ন হয়েছে। আবার ধাতব জিঙ্কের টুকরোয় থাকা Zn পরমাণু থেকে দ্রবণ জিঙ্ক আয়ন (Zn^{2+}) এসেছে। তাহলে এখানে জারণ-বিজারণ বিক্রিয়ার সমীকরণ দুটো কী কী?

বিজারণ বিক্রিয়া : $2H^+ + 2e^- \rightarrow H_2$ জারণ বিক্রিয়া : $Zn \rightarrow Zn^{2+} + 2e^-$

হলুদ রং-এর ফেরিক ক্লোরাইড ($FeCl_3$) দ্রবণে বর্ণহীন স্ট্যানাস ক্লোরাইড ($SnCl_2$) দ্রবণ যোগ করলে খুব ফিকে সবুজ রং-এর ফেরাস ক্লোরাইড ($FeCl_2$) দ্রবণ উৎপন্ন হয়। একইসঙ্গে স্ট্যানিক ক্লোরাইড ($SnCl_4$) উৎপন্ন হয়।

$$2FeCl_3 + SnCl_2 \rightarrow 2FeCl_2 + SnCl_4$$

এই বিক্রিয়াটিতে শুধু ধনাত্মক আধানযুক্ত আয়নগুলোরই আধানের (চার্জের) পরিবর্তন ঘটে। তাই বিক্রিয়াটিকে যদি নীচের মতো করে লেখা যায় —

$$2Fe^{3+} + Sn^{2+} \rightarrow 2Fe^{2+} + Sn^{4+}$$

তাহলে এই বিক্রিয়ায় ফেরিক আয়ন (Fe^{3+}) একটা ইলেকট্রন গ্রহণ করে ফেরাস আয়নে (Fe^{2+}) পরিণত হয়েছে, অর্থাৎ ফেরিক আয়নের বিজারণ ঘটেছে।

$$2Fe^{3+}+2e^- \rightarrow 2Fe^{2+}$$

আবার স্ট্যানাস আয়ন (Sn^{2+}) দুটো ইলেকট্রন ত্যাগ করে স্ট্যানিক আয়নে (Sn^{4+}) পরিণত হয়েছে। তাই এই বিক্রিয়ায় স্ট্যানাস আয়নের জারণ ঘটেছে।

$$Sn^{2+} \rightarrow Sn^{4+}+2e^-$$

এই বিক্রিয়ায় তাহলে জারক-বিজারক কী করে চেনা যাবে?

যে পদার্থ ইলেকট্রন গ্রহণ করেছে অর্থাৎ নিজে বিজারিত হয়েছে, সেই পদার্থটা হলো জারক। আর যে পদার্থ ইলেকট্রন ত্যাগ করেছে তা নিজে জারিত হয়েছে। সেই পদার্থটা হলো বিজারক। তাহলে ওপরের বিক্রিয়ায় ফেরিক ক্লোরাইড (আরো ভালোভাবে বললে Fe^{3+}) হলো জারক, আর স্ট্যানাস ক্লোরাইড (অর্থাৎ তার মধ্যে থাকা Sn^{2+}) হলো বিজারক।

এতক্ষণ পর্যন্ত জারণ-বিজারণ বিক্রিয়া চেনা ও তার বিভিন্ন ধরনের ব্যাখ্যা সম্বন্ধে আমাদের যে ধারণা হলো তার থেকে সাধারণভাবে লেখা যায়—

জারণ

(i) অক্সিজেন (অথবা ক্লোরিন) যুক্ত হওয়া
(ii) হাইড্রোজেন বেরিয়ে যাওয়া
(iii) কোনো মৌলের পরমাণু বা আয়ন বা কোনো মূলক থেকে ইলেকট্রন বেরিয়ে যাওয়া

এবং

বিজারণ

(i) অক্সিজেন (অথবা ক্লোরিন) বেরিয়ে যাওয়া
(ii) হাইড্রোজেন যুক্ত হওয়া
(iii) কোনো মৌলের পরমাণু বা আয়ন বা কোনো মূলকে ইলেকট্রন যুক্ত হওয়া

তাহলে জারক ও বিজারক পদার্থ সম্বন্ধে সাধারণভাবে বলা যায় যে—

জারক পদার্থ

(i) কোনো পদার্থে অক্সিজেন (অথবা ক্লোরিন) যুক্ত করে
(ii) কোনো পদার্থ থেকে হাইড্রোজেন অপসারণ করে
(iii) কোনো পরমাণু বা আয়ন বা মূলক থেকে ইলেকট্রন অপসারণ করে

এবং

বিজারক পদার্থ

(i) কোনো পদার্থ থেকে অক্সিজেন (অথবা ক্লোরিন) অপসারণ করে
(ii) কোনো পদার্থে হাইড্রোজেন যুক্ত করে
(iii) কোনো পরমাণু বা আয়ন বা মূলকে ইলেকট্রন যুক্ত করে

পরের পৃষ্ঠায় কতকগুলো বিক্রিয়ার সমীকরণ দেওয়া আছে। তা থেকে জারণ-বিজারণ বিক্রিয়া ও জারক-বিজারক চিহ্নিত করো। প্রতিক্ষেত্রে ওপরের কোন ধারণাটির সাহায্য তুমি নিলে তা লেখো।

বিক্রিয়ার সমীকরণ	জারণ বিক্রিয়া	বিজারণ বিক্রিয়া	জারক	বিজারক	কোন ধারণার সাহায্যে এমন বলা যায়
(i) $H_2S + 2FeCl_3 \rightarrow 2HCl + S + 2FeCl_2$ (ii) $2Na + H_2 \rightarrow 2NaH$ (iii) $Zn + CuSO_4 \rightarrow ZnSO_4 + Cu$ (iv) $FeO + CO \rightarrow Fe + CO_2$ (v) $FeSO_4 + Zn \rightarrow ZnSO_4 + Fe$	$2Na \rightarrow 2Na^+ + 2e^-$	$H_2 + 2e^- \rightarrow 2H^-$			

জারক ও বিজারক দ্রব্য

বহু প্রাচীন যুগের শিল্পীরা যাঁরা মৃৎপাত্র তৈরির যুগ থেকে কালক্রমে ধাতুর পাত্র তৈরির কৌশল রপ্ত করেছিলেন এবং পরবর্তীকালে বিজ্ঞানীগণ যাঁরা ধাতুর আকরিক থেকে ধাতু নিষ্কাশন প্রক্রিয়া সম্বন্ধে জানতেন এমন প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে। ধাতুর আকরিক থেকে ধাতু নিষ্কাশন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই একটা বিজারণ প্রক্রিয়ার সাহায্য নিতে হয়। অতি পুরোনো দিনে বিজ্ঞান ও কারিগরিবিদ্যার এত উন্নতি হয়নি। তাই মনে করা হয় এই সমস্ত রাসায়নিক প্রক্রিয়া যাঁরা রপ্ত করেছিলেন তাঁদের জারক-বিজারক দ্রব্য সম্বন্ধে একটা ধারণা, অন্তত হাতেকলমে হলেও, ছিল।

আমরা জারণ-বিজারণ প্রক্রিয়া ব্যাখ্যার সময় দেখেছি যে, কোনো পদার্থ জারিত হলে তা অন্য পদার্থকে বিজারিত করে। একইভাবে কোনো পদার্থ বিজারিত হলে তার বিজারণের জন্য দায়ী পদার্থটি (বিজারক দ্রব্য) জারিত হয়।

অর্থাৎ জারণের সময় জারক দ্রব্য নিজে বিজারিত হয় এবং বিজারণের সময় বিজারক দ্রব্য নিজে জারিত হয়।

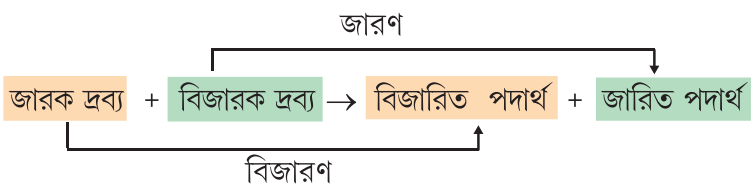

নীচের বিক্রিয়াগুলো থেকে এই বিষয়টা সহজেই বোঝা যায়।

(i) উত্তপ্ত কালো রং-এর কিউপ্রিক অক্সাইডের ওপর দিয়ে হাইড্রোজেন গ্যাস চালনা করলে কিউপ্রিক অক্সাইড বিজারিত হয়ে লাল ধাতব কপারে পরিণত হয় এবং হাইড্রোজেন জারিত হয়ে জল উৎপন্ন করে।

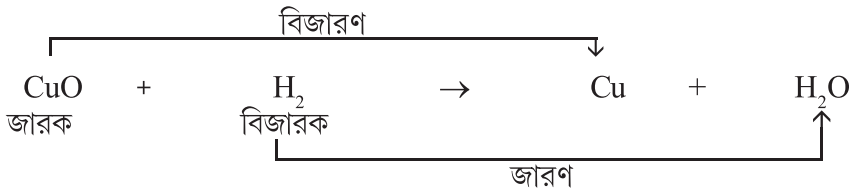

(ii) কালো রঙের কঠিন ম্যাঙ্গানিজ ডাইঅক্সাইডের সঙ্গে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের লঘু দ্রবণের বিক্রিয়া করালে HCl জারিত হয়ে ঝাঁঝালো গন্ধযুক্ত ক্লোরিন গ্যাস বেরিয়ে আসে। আর ম্যাঙ্গানিজ ডাইঅক্সাইড বিজারিত হয়ে ম্যাঙ্গানাস ক্লোরাইড উৎপন্ন হয়।

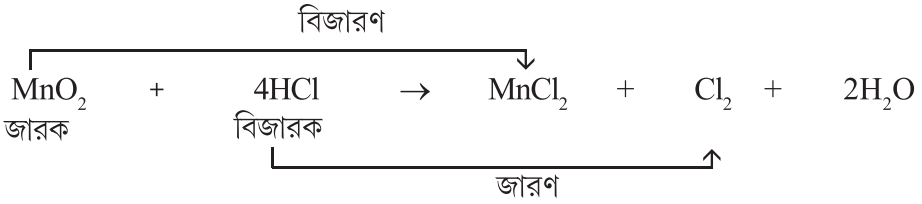

(iii) বর্ণহীন তরল হাইড্রোজেন ব্রোমাইডের মধ্য দিয়ে ঝাঁঝালো ক্লোরিন গ্যাস পাঠালে হাইড্রোজেন ব্রোমাইড জারিত হয়ে লাল রং-এর তরল ব্রোমিনে পরিণত হয়। আর ক্লোরিন বিজারিত হয়ে হাইড্রোজেন ক্লোরাইড উৎপন্ন করে।

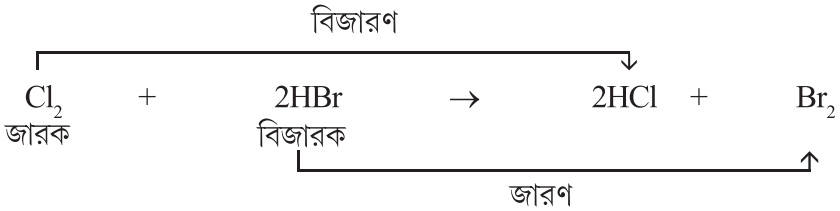

ওপরের উদাহরণগুলো থেকে স্পষ্ট যে জারক বা বিজারক মৌলিক পদার্থও হতে পারে অথবা যৌগিক পদার্থও হতে পারে। এই উদাহরণগুলোতে যেসব জারক-বিজারক পদার্থের কথা জানলে তাদের প্রকৃতি সম্বন্ধে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে নীচে লেখো।

জারক না বিজারক	নাম ও সংকেত	মৌলিক না যৌগিক পদার্থ

এমন আরও অনেক জারক-বিজারক পদার্থের উদাহরণ পাওয়া যাবে যারা নিজেদের ধর্ম অনুসারে প্রকৃতিতে, এমনকি জীবদেহের মধ্যেও বিক্রিয়া করে চলেছে।

এই যে তোমরা খোলা বাতাসে পড়ে থাকা লোহার জিনিসে মরচে পড়তে দেখো, জানো কি তাতে বছরে কত কোটি টাকা নষ্ট হয়? আমরা আগেই জেনেছি যে খোলা হাওয়ায় আর জলের সংস্পর্শে পড়ে থাকতে থাকতেই লোহায় ধীরে ধীরে মরচে ধরে। মরচে হলো জলযুক্ত ফেরিক অক্সাইড ($Fe_2O_3.nH_2O$; n মানে জলের অণুর সংখ্যা, যা নির্দিষ্ট নয়)। মরচে ধরার সময় লোহার জারণ ঘটে; প্রথমে ফেরাস আয়ন (Fe^{2+}) ও পরে আরো জারণ ঘটে ফেরিক আয়ন (Fe^{3+}) উৎপন্ন হয়। আমরা দেখেছি যে কোনো বিক্রিয়ায় শুধু জারণ

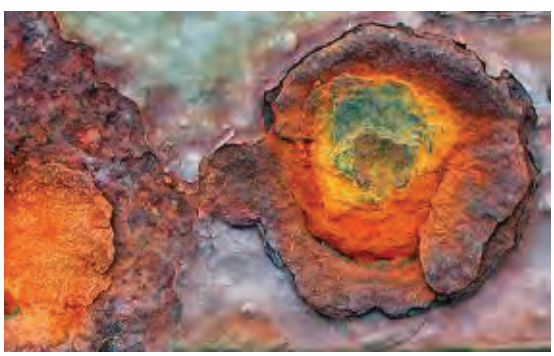

ঘটে না। তার সঙ্গে বিজারণও ঘটে। তাহলে এখানে বিজারণ বিক্রিয়াটা কী? মরচে ধরার সময় দুটো বিজারণ বিক্রিয়া ঘটে:

(1) জলের হাইড্রোজেন আয়নের (H^+) বিজারণে H_2 গ্যাস উৎপন্ন হয় এবং

(2) অক্সিজেন গ্যাসের বিজারণে জল তৈরি হয়।

মরচে ধরা আটকাতে কী কী করা হয়?

- লোহার উপরে তেল রং বা আলকাতরার প্রলেপ দিলে লোহা জল ও বাতাসের সংস্পর্শে আসতে পারে না। ফলে সহজে মরচে ধরে না।
- লোহার উপরে জিঙ্কের আস্তরণ দিলে জিঙ্ক লোহার মরচে ধরায় বাধা দেয়। এই পদ্ধতিকেই গ্যালভানাইজেশন বলে।

অনেকদিন পড়ে থাকা নারকেল তেল বা সরষের তেলের গন্ধ শুঁকে দেখেছ কখনও? সাধারণ কথায় আমরা বলি 'তেলচিটে গন্ধ বেরোচ্ছে।' এই গন্ধ হয় তেলের সঙ্গে বাতাসের অক্সিজেনের বিক্রিয়ায় তৈরি হওয়া কিছু যৌগের জন্য। এই ঘটনাও একধরনের জারণ। অবশ্য, বাতাসের জলীয় বাষ্পও তেলের সঙ্গে বিক্রিয়া করে এবং তা থেকে উৎপন্ন পদার্থও 'তেলচিটে' গন্ধের জন্য দায়ী।

কোনো কোনো ফল যেমন আপেল, ডাব কেটে রাখলে কিছুক্ষণের মধ্যে তার কাটা অংশে বাদামি ছোপ ধরে। নীচের ছবি দুটো ভালো করে লক্ষ করো। এই বিক্রিয়াগুলো ফলের মধ্যে থাকা কিছু কিছু জৈব যৌগের জারণ। অনেক সময় ফলের মধ্যে থাকা কিছু উৎসেচক অক্সিজেনের সাহায্যে বিশেষ কিছু জৈব যৌগের জারণ ঘটায়। তার ফলেই ওই বাদামি ছোপ ধরে।

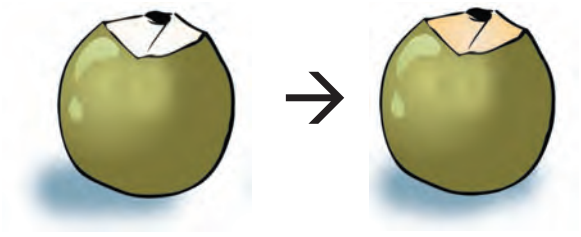

ডাবের কাটা মুখে বাদামি ছোপ ধরছে

কাটা আপেলে বাদামি ছোপ ধরছে

নীচের ছবিগুলোতে তোমার চেনা দুটো দৃশ্য দেখতে পাচ্ছো। এর সঙ্গে জারণ-বিজারণের সম্পর্ক কোথায়?

2.4 তড়িতের রাসায়নিক প্রভাব

তড়িৎ বিশ্লেষণ ও তড়িৎ লেপন

কারা তড়িতের পরিবাহী ?

হাতেকলমে বিভিন্ন বস্তুর তড়িৎ পরিবাহিতা কেমন তা বোঝার জন্য ধাতু-অধাতুর তড়িৎ পরিবাহিতা ধর্ম পরীক্ষা করার জন্য একটা সহজ বর্তনী পরীক্ষক বা টেস্টার তৈরি করার পদ্ধতি আমরা জেনেছি।

হাতেকলমে

আগের তৈরি টেস্টারের খোলা তারের দু-প্রান্ত এবার তোমার চেনা কয়েকটা কঠিন পদার্থে তৈরি জিনিসের দু-প্রান্তে স্পর্শ করে দেখো তারা কতটা পরিবাহী। যখন বালব জ্বলবে তখন বুঝতে পারবে ওই বস্তুটার মধ্যে দিয়ে নিশ্চয়ই তড়িৎ প্রবাহিত হচ্ছে। অর্থাৎ, বস্তুটা তড়িতের সুপরিবাহী। আর যখন বালব জ্বলবে না তখন বোঝা যাবে যে ওই বস্তুর মধ্যে দিয়ে তড়িৎ সহজে যেতে পারে না অর্থাৎ ওই বস্তু তড়িতের কুপরিবাহী বা অন্তরক।

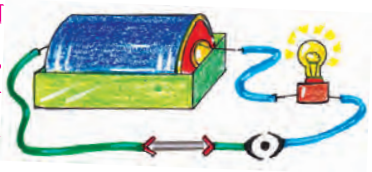

তোমার তৈরি টেস্টার ব্যবহার করে নীচের বস্তুগুলোর পরিবাহিতা সম্বন্ধে তোমার ধারণা নীচে লেখো।

টেস্টারে স্পর্শ করা বস্তুর নাম	টেস্টারের বালব জ্বলছে, না জ্বলছে না	বস্তুটার মধ্যে দিয়ে তড়িৎ যেতে পারে কী	বস্তুটা তড়িতের সুপরিবাহী না কুপরিবাহী
কাগজের টুকরো			
পাথর বা ইটের টুকরো			
কাঠের টুকরো			
রাবার বা ইরেজার			
লোহার পেরেক			

তোমরা লক্ষ করে থাকবে যখন ইলেকট্রিকের মিস্ত্রিরা চালু লাইনে কাজে করেন, তখন বাঁশ বা কাঠের সিঁড়িতে অথবা কোনো কাঠের জিনিসের ওপর দাঁড়িয়ে কাজটা করেন। তাঁরা কেন এমন করেন বলে মনে হয়?

এভাবে পরীক্ষা করে তুমি বিভিন্ন কঠিন বস্তুর তড়িৎ পরিবাহিতা কেমন তা বুঝতে পারবে। কিন্তু তরল পদার্থের পরিবাহিতাও কি একইভাবে পরীক্ষা করা সম্ভব?

একটু খেয়াল করলেই দেখবে তোমাদের বাড়ির বড়োরা ভিজে হাতে ইলেকট্রিকের সুইচ বা কোনো জিনিসে হাত দিতে বারণ করেন। আবার কোনো সময়ে তুমি যদি ভুল করে ভিজে হাত দিয়েও থাকো সামান্য শক লেগেছে এমন অভিজ্ঞতাও তোমাদের থাকতে পারে। তাহলে জল কি কোনোভাবে সামান্য হলেও তড়িৎ পরিবহণ করে?

এমন প্রশ্ন তোমাদের মনে আসাই স্বাভাবিক। জল বা অন্য তরলের তড়িৎ পরিবাহিতা তোমার তৈরি টেস্টারের সাহায্যে পরীক্ষা করে দেখো। তবে এবারে কিন্তু একটা সাধারণ সেল নিলে হবে না। দুটো বা তিনটে সেলের একটা ব্যাটারি নিতে হবে পরীক্ষার জন্য। এই ধরনের পরীক্ষা বাড়ির ইলেকট্রিকের লাইন থেকে অথবা ইনভার্টার থেকে বিদ্যুৎ নিয়ে কখনোই করতে যাবে না।

হাতেকলমে

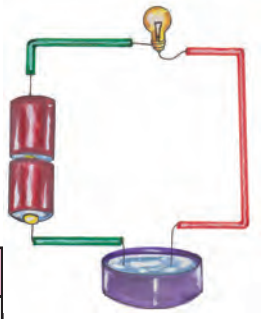

একটা বড়োমুখের প্লাস্টিকের বোতলের ঢাকনা নাও। তার মধ্যে কিছুটা ছেঁকে নেওয়া পাতিলেবুর রস বা ভিনিগার নাও। তারপর তোমার তৈরি টেস্টারের খোলা তার দুটোর প্রান্ত ওই লেবুর রস বা ভিনিগারের মধ্যে ডোবাও। এবার নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে লেখো।

কী দেখলে	তরলটা তড়িতের ভালো পরিবাহী, না তা নয়

কোনো তরল যদি তড়িতের সুপরিবাহী না হয়ে, কম মাত্রায় পরিবাহী হয় তবে তোমার তৈরি টেস্টারের দুটো খোলা প্রান্তের মধ্যের তরলের মধ্যে দিয়ে কম পরিমাণে তড়িৎ যাবে। কিন্তু আমরা জানি তড়িতের প্রভাবেই বালবের ফিলামেন্টটা গরম হয়ে আলো জ্বলে। কম মাত্রায় তড়িৎ গেলে বালব জ্বলবে না । তার অর্থ এই নয় যে তরলটার মধ্যে দিয়ে তড়িত প্রবাহিত হচ্ছে না। এই অসুবিধা দূর করে আমরা কীভাবে কোনো তরল কম মাত্রায় তড়িতের পরিবাহী হলেও বুঝতে পারব?

একটা উপায় হলো তোমার তৈরি টেস্টারে বালবের বদলে টর্চে ব্যবহারের উপযুক্ত LED ব্যবহার করা। কারণ কম তড়িৎ প্রবাহিত হলেও LED জ্বলতে পারে।

তবে সামান্য বিদ্যুৎ যদি তারের মধ্যে দিয়ে যায় তা কিন্তু LED লাগানো টেস্টার দিয়ে বোঝা সম্ভব নয়। তখন তাহলে কী করা হবে?

যে তারের মধ্যে দিয়ে তড়িৎ যাচ্ছে বলে পরীক্ষা করতে হবে, বর্তনীতে যুক্ত অবস্থায় ওই তারকে দু-হাত দিয়ে একটু উঁচু করে ধরো। তারপর উত্তর-দক্ষিণ বরাবর স্থির হয়ে থাকা একটা চুম্বক শলাকার ওপর তারটা ধরো।

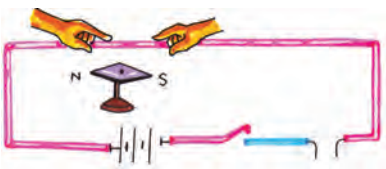

যদি ওই তারের মধ্যে দিয়ে একটুও তড়িৎ প্রবাহিত হয় তবে ওই তারের চারপাশে চৌম্বক ক্ষেত্র সৃষ্টি হবে। আর তার প্রভাবে চুম্বক শলাকাটা তার স্থির অবস্থা থেকে একটু হলেও সরে যাবে অর্থাৎ শলাকাটার বিক্ষেপ হবে। এভাবেই একটা প্লাস্টিকের বোতলের ঢাকনিতে বিভিন্ন তরল নিয়ে তাদের পরিবাহিতা পরীক্ষা করো। যা দেখতে পেলে তা নীচের সারণিতে লেখো।

তরলের নাম	শলাকার বিক্ষেপ কেমন	তরলটা তড়িতের খুব বেশি পরিবাহী, না পরিবাহিতা কম
(i) পাতিলেবুর রস		
(ii) পানীয় জল		
(iii) ভিনিগার দ্রবণ		
(iv) নারকেল তেল		
(v) মধু		

হাতেকলমে

একটা প্লাস্টিকের বোতলের ঢাকনি নিয়ে তার মধ্যে দু-চামচ পাতিত জল নাও। (যদি স্কুলে না পাও তবে ডাক্তারখানা বা ওষুধের দোকান থেকেও জোগাড় করতে পারো এই জল)। এরপর তোমার তৈরি টেস্টারের দু-প্রান্ত ওই জলের মধ্যে ডোবাও । চুম্বক শলাকার বিক্ষেপ ঘটেছে কিনা লক্ষ করো। তারপর ওই জলের মধ্যে এক চিমটে খাবার নুন মিশিয়ে একইভাবে ওই দ্রবণের তড়িৎ পরিবাহিতা পরীক্ষা করো। এই কাজে ওপরের মতোই চুম্বক শলাকার বিক্ষেপ দেখে তোমার পর্যবেক্ষণ লেখো।

কোন তরলের	পরিবাহিতা কেমন
পাতিত জল	
পাতিত জলে নুনের দ্রবণ	

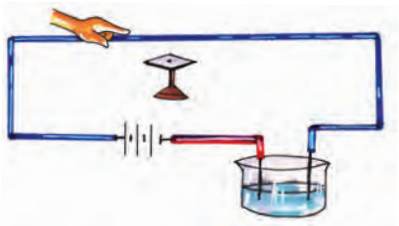

ওপরের পরীক্ষা থেকে স্পষ্টই দেখা যায় যে নুন মেশানো পাতিত জল তড়িতের সুপরিবাহী। যে-কোনো উৎস থেকে পাওয়া জলেও একাধিক লবণ বা ধাতব যৌগ মিশে থাকে, যেগুলো পানীয় জলকে তড়িৎ পরিবাহী করে তুলতে সাহায্য করে। আবার পানীয় জলে মিশে থাকা এইসব খনিজ পদার্থ আমাদের শরীরের পক্ষে প্রয়োজনীয়। তাছাড়াও, খাবার নুনের মাধ্যমেও আমরা একাধিক লবণ গ্রহণ করি। তাহলে আমাদের শরীর কেমন হবে — তড়িতের সুপরিবাহী না কুপরিবাহী?

এই কারণেই ভিজে হাতে বা খালি পায়ে ভিজে মেঝেতে দাঁড়িয়ে ইলেকট্রিকচালিত জিনিসপত্র বা সুইচবোর্ডে হাত দিলে শক লাগার সম্ভাবনা থাকে।

তড়িৎ বিশ্লেষণ ও তড়িৎ বিশ্লেষ্য

তোমরা জেনেছ যে সালফিউরিক অ্যাসিড-মেশানো জলের মধ্যে দিয়ে বিদ্যুৎ পাঠালে জল বিশ্লিষ্ট হয়ে হাইড্রোজেন আর অক্সিজেন গ্যাস তৈরি হয় ($2H_2O \rightarrow 2H_2 + O_2$)। তোমরা এও জেনেছ যে গলিত সোডিয়াম ক্লোরাইডের মধ্যে দিয়ে বিদ্যুৎ পাঠানো যায়। গলিত অবস্থায় বা দ্রবণে কোনো পদার্থের মধ্যে দিয়ে বিদ্যুৎ পাঠিয়ে রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটানোর নাম তড়িৎ বিশ্লেষণ (electrolysis)। তড়িৎ বিশ্লেষণ আমাদের অনেক কাজে লাগে, তাই একটু জেনে নেওয়া যাক।

তড়িৎ বিশ্লেষণের গোড়ার কথা

কোনো কিছুর মধ্যে দিয়ে বিদ্যুৎ যেতে হলে কোনো-না-কোনো আধানযুক্ত কণার চলন হতেই হবে। যেমন ধরো ধাতুর মধ্যে দিয়ে বিদ্যুৎ যাওয়া মানে হলো ইলেকট্রন চলাচল। কিন্তু অ্যাসিড মেশানো জল বা গলিত সোডিয়াম ক্লোরাইডের (NaCl, নুন) মধ্যে দিয়ে বিদ্যুৎ যায় আয়নদের মাধ্যমে, ইলেকট্রনের মাধ্যমে নয়।

কোনো যৌগ দ্রবীভূত বা গলিত অবস্থায় তড়িৎ পরিবহণে সক্ষম হলে তাকে তড়িৎ বিশ্লেষ্য বা ইলেকট্রোলাইট (Electrolyte) বলা হয়। তড়িৎ বিশ্লেষ্যের উদাহরণ হলো অ্যাসিড বা ক্ষার দ্রবণ, কোনো লবণের জলীয় দ্রবণ, গলিত NaCl ইত্যাদি।

কিছু তড়িৎ বিশ্লেষ্য আছে যারা দ্রবণে পুরোটাই আয়ন হয়ে থাকে। এদের বলে তীব্র তড়িৎ বিশ্লেষ্য। উদাহরণ হলো NaCl, KOH, H_2SO_4, $CuSO_4$ ইত্যাদি। আবার কিছু তড়িৎবিশ্লেষ্য আছে যারা দ্রবণে সামান্য মাত্রায় আয়নিত হয় যেমন অ্যাসিটিক অ্যাসিড (CH_3COOH)। এদের বলা হয় মৃদু তড়িৎ বিশ্লেষ্য।

আমাদের চেনা অনেক জলে দ্রাব্য পদার্থ তড়িৎ বিশ্লেষ্য নয়। যেমন ধরো চিনি, গ্লুকোজ, অ্যালকোহল ইত্যাদি। আবার জলে দ্রাব্য নয় কিন্তু সহজেই গলিয়ে ফেলা যায় এমন অনেক জিনিস — মোম, মাখন, ঘি— এরাও তড়িৎ বিশ্লেষ্য নয়। কেন এরা তড়িৎ বিশ্লেষ্য হলো না? কারণ তড়িৎ বিশ্লেষ্য হতে গেলে গলিত বা দ্রবীভূত অবস্থায় আয়ন দিতেই হবে। এইসব যৌগেরা কেউই আয়ন দেয় না, তাই এরা তড়িৎ বিশ্লেষ্য নয়। এরা তড়িৎ অবিশ্লেষ্য (Non-electrolyte)।

নীচের সারণিতে তোমাদের চেনা বেশ কিছু যৌগ এবং জলে গুললে আয়ন দেয় কিনা বলা হলো। তুমি এই তথ্য থেকে কোনটি তড়িৎ বিশ্লেষ্য আর কোনটি তড়িৎ বিশ্লেষ্য নয় তা চিহ্নিত করো ঃ

যৌগের নাম	জলীয় দ্রবণে যৌগগুলি যথেষ্ট আয়ন দেয় কি? যদি দেয় তবে কী কী আয়ন দেয়?	জলীয় দ্রবণ কি তড়িৎ পরিবাহী হওয়া উচিত ?	তড়িৎ বিশ্লেষ্য, না তড়িৎ অবিশ্লেষ্য?
সোডিয়াম ক্লোরাইড	হ্যাঁ; Na^+ ও Cl^-	হ্যাঁ	তড়িৎ বিশ্লেষ্য
চিনি	না	না	তড়িৎ অবিশ্লেষ্য
পটাশিয়াম হাইড্রক্সাইড	হ্যাঁ; K^+ ও OH^-		
অ্যালকোহল	না		
অ্যামোনিয়াম সালফেট	হ্যাঁ; NH_4^+ ও SO_4^{2-}		
সালফিউরিক অ্যাসিড	হ্যাঁ; H^+ ও SO_4^{2-}		
পটাশিয়াম নাইট্রেট	হ্যাঁ; K^+ ও NO_3^-		
কপার সালফেট	হ্যাঁ; Cu^{2+} ও SO_4^{2-}		
গ্লুকোজ	না		

তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম যে তড়িৎ বিশ্লেষ্য যৌগ মানে জলীয় দ্রবণে বা গলিত অবস্থায় যথেষ্ট সংখ্যক আয়ন উৎপন্ন করার ক্ষমতা থাকবে।

তড়িৎ বিশ্লেষণ করতে হলে কী কী চাই?

প্রথমে নিশ্চয়ই চাই একটা উপযুক্ত তড়িৎ বিশ্লেষ্যের দ্রবণ অথবা গলিত তড়িৎ বিশ্লেষ্য। চাই বিদ্যুৎ পাঠাবার জন্য ব্যাটারি, আর দুটো ধাতুর তার (বা ধাতুর পাত বা গ্রাফাইটের রড) যাদের মধ্যে দিয়ে ব্যাটারি থেকে তড়িৎ যাবে। এদের বলা হয় তড়িৎ দ্বার [তড়িৎ দ্বার মানে যার মধ্যে দিয়ে বিদ্যুৎ যাবে, ইংরেজিতে 'ইলেকট্রোড' (Electrode)]। তড়িৎ দ্বার দুটোকে দ্রবণে ডুবিয়ে তড়িৎ বিশ্লেষণ শুরু করতে হবে। বিদুৎ যাবার জন্য প্লাস্টিকের আস্তরণ দেওয়া তামার তারও চাই।

হাতেকলমে

পাশের ছবির মতো করে ব্যাটারি সংযোগ করো। সামান্য সালফিউরিক অ্যাসিড-মেশানো জলের তড়িৎ বিশ্লেষণ করার জন্য দ্রবণে তড়িৎ দ্বার দুটো ডোবাও। ব্যাটারির (+) প্রান্তের সঙ্গে যুক্ত তড়িৎ দ্বারকে অ্যানোড (anode) আর (–) প্রান্তের সঙ্গে যুক্ত তড়িৎ দ্বারকে

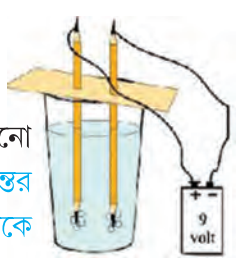

বলে ক্যাথোড (cathode)। একটু পরে দেখতে পাবে যে তড়িৎ দ্বারটা ব্যাটারির (–) প্রান্তের সঙ্গে যেখানে যুক্ত সেখানে বুদবুদ বেরোচ্ছে। এই গ্যাসটা কী? পরীক্ষায় প্রমাণিত হয় এটা হলো হাইড্রোজেন গ্যাস (H_2)। ব্যাটারির (+) প্রান্তের সঙ্গে যুক্ত তড়িৎ দ্বারেও আরেকটা গ্যাসের বুদবুদ তৈরি হচ্ছে। এটা হলো অক্সিজেন।

তাহলে কী হলো : $2H_2O$ (তরল) $\xrightarrow[\text{তড়িৎ}]{}$ $2H_2$ (গ্যাস) + O_2 (গ্যাস)

এই হলো তোমাদের হাতেকলমে পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে তড়িৎ বিশ্লেষণ। তোমাদের মনে প্রশ্ন আসতে পারে যে বিশুদ্ধ জল নিয়ে এই পরীক্ষা করা হলো না কেন? আসলে বিশুদ্ধ জলে আয়ন সংখ্যা এতই কম যে তা তড়িতের সুপরিবাহী নয়। তড়িৎ বিশ্লেষণ করতে হলে তাই জলের মধ্যে আয়ন সংখ্যা বাড়াতেই হবে। এই উদ্দেশ্যে জলের সঙ্গে সামান্য ক্ষার (NaOH বা KOH) কিংবা সামান্য অ্যাসিড (H_2SO_4) মেশাতে হয়। এরা তীব্র তড়িৎ বিশ্লেষ্য, তাই এগুলো মেশালে দ্রবণে আয়নের সংখ্যা অনেক বেড়ে যায়। তখন তড়িৎ বিশ্লেষণ করা সম্ভব হয়।

তড়িৎ বিশ্লেষণের সময় গলিত পদার্থ বা দ্রবণের মধ্যে দিয়ে তড়িৎ পরিবহণ করে ক্যাটায়ন ও অ্যানায়ন গুলো। কোনো সময়েই গলিত অবস্থা বা দ্রবণের মধ্যে দিয়ে ইলেকট্রন চলাচল করে না।

জলীয় দ্রবণে থাকা অবস্থায় পদার্থের তড়িৎ পরিবহণ ও তড়িৎ বিশ্লেষণ সম্বন্ধে কিছুটা ধারণা আমরা পেয়েছি। কিন্তু গলিত অবস্থায় তড়িৎ বিশ্লেষ্য পদার্থ কীভাবে তড়িৎ পরিবহণ করে ও তাদের তড়িৎ বিশ্লেষণ ঘটে?

স্বাভাবিক অবস্থায় কঠিন অথচ গলিত অবস্থায় তড়িৎ বিশ্লেষ্য এমন পদার্থের উদাহরণ হলো সোডিয়াম ক্লোরাইড (NaCl)।

এই গলিত NaCl-এর মধ্যে দিয়ে উপযুক্ত তড়িৎ দ্বার ব্যবহার করে তড়িৎ চালনা করলে কী ঘটবে?

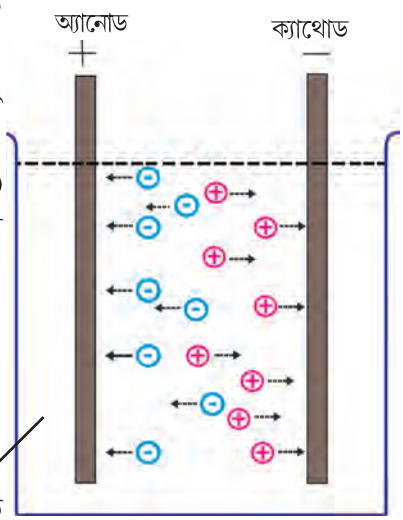

NaCl থেকে উৎপন্ন সোডিয়াম (Na^+) ও ক্লোরাইড (Cl^-) আয়নগুলো যথাক্রমে ক্যাথোড ও অ্যানোডের দিকে এগোবে। তারপর তড়িৎ দ্বারের সংস্পর্শে এসে মৌলরূপে মুক্ত হবে।

ক্যাথোডে ঘটা বিক্রিয়া : $Na^+ + e^- \rightarrow Na$ (ধাতু) (বিজারণ)

অ্যানোডে ঘটা বিক্রিয়া : $Cl^- \rightarrow Cl + e^-$ (জারণ)

$2Cl \rightarrow Cl_2$ (গ্যাস)

তড়িৎ বিশ্লেষণ প্রক্রিয়ার আরও কয়েকটা বিশেষত্ব

(i) লক্ষ করো জলের তড়িৎ বিশ্লেষণে যেখানে ক্যাথোডে ও অ্যানোডে উৎপন্ন দুটো পদার্থই গ্যাসীয় হয়, সেখানে গলিত NaCl-এর তড়িৎ বিশ্লেষণে তড়িৎ দ্বারে উৎপন্ন পদার্থের মধ্যে একটা ধাতু (গলিত Na) অন্যটা কিন্তু গ্যাস। তাহলে আমরা বলতে পারি যে তড়িৎ বিশ্লেষণের ফলে তড়িৎদ্বারে বিভিন্ন অবস্থা বা প্রকৃতির পদার্থই উৎপন্ন হতে পারে।

(ii) আবার লক্ষ করে দেখো যে গলিত NaCl-এর তড়িৎবিশ্লেষণের জন্য 'উপযুক্ত তড়িৎ দ্বার' শব্দটা সতর্কভাবে ব্যবহার করা হয়েছে। কারণ, তড়িৎ দ্বারের প্রকৃতিও অনেকসময় তড়িৎ বিশ্লেষণ প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করতে পারে। কখনো কখনো তড়িৎ বিশ্লেষণের আগে-পরে তড়িৎ বিশ্লেষ্যের দ্রবণের রং-এর পরিবর্তনও ঘটে যেতে পারে। যেহেতু ক্যাথোডে ইলেকট্রন গ্রহণ বিক্রিয়া ঘটে তাই ক্যাথোডে বিজারণ ঘটে। আর অ্যানোডে ইলেকট্রন ত্যাগ করার বিক্রিয়া ঘটে, তাই অ্যানোডে জারণ ঘটে।

ওপরে আমরা দেখলাম যে গলিত NaCl-এর তড়িৎ বিশ্লেষণ করে সোডিয়াম ধাতু পাওয়া যায়। এভাবেই

ক্যালশিয়াম ও ম্যাগনেশিয়াম ধাতুও তাদের ক্লোরাইড যৌগ থেকে পাওয়া যায়। নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে লেখো কীভাবে এই ধাতুগুলো পাওয়া সম্ভব।

তড়িৎ বিশ্লেষ্যের নাম	কোন ধাতু পাওয়া সম্ভব	ক্যাথোডে বিক্রিয়া	অ্যানোডে বিক্রিয়া
গলিত ক্যালশিয়াম ক্লোরাইড			
গলিত ম্যাগনেশিয়াম ক্লোরাইড			

গলিত ধাতব যৌগ থেকে ক্যাথোডে ধাতুটা পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অ্যানোডেও একটা প্রয়োজনীয় পদার্থ উৎপন্ন হতে পারে। যেমন — গলিত NaCl- এর তড়িৎ বিশ্লেষণে অ্যানোডে ক্লোরিন গ্যাস (Cl_2) উৎপন্ন হয়। প্রয়োজনীয় মূল পদার্থের সঙ্গে উৎপন্ন এরকম পদার্থকে তড়িৎ বিশ্লেষণ প্রক্রিয়ার উপজাত পদার্থ বলে। এধরনের উপজাত পদার্থও ব্যবহারিক ক্ষেত্রে তড়িৎ বিশ্লেষণ প্রক্রিয়া অবলম্বন করতে অনেকসময়েই রসায়নবিদদের উৎসাহিত করে।

এসো আমরা কোনো কিছু লেখার জন্যে একটা নতুন ধরনের বোর্ড ব্যবহার করি। একটা পাতলা টিনের পাত নাও (সুবিধামতো অন্য ধাতুর পাতও নিতে পারো যা তড়িতের পরিবাহী)। পাতটার ওপর জলের সঙ্গে স্টার্চ (অ্যারারুট) ও পটাশিয়াম আয়োডাইডের একটা লেই তৈরি করে পাতলা করে মাখিয়ে নাও। এবার পাশের ছবির মতো করে একটা ব্যাটারির নেগেটিভ প্রান্ত তার দিয়ে পাতে যোগ করো। ব্যাটারির অন্য প্রান্তে অন্য একটু শক্ত তার যোগ করে তার খোলা প্রান্তটা পাতটার ওপরের লেইতে স্পর্শ করাও। এরপর ধীরে ধীরে তোমার পছন্দমতো কোনো শব্দ লেখো ওই লেইটার ওপর। কেমন লেখা পড়ছে! কেন এমন ঘটল তা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করো ও শিক্ষক/শিক্ষিকাদের সাহায্যে বোঝার চেষ্টা করো।

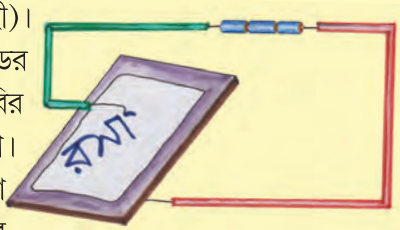

তড়িৎ বিশ্লেষণের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যবহার

(ক) ধাতু নিষ্কাশন : তড়িৎ বিশ্লেষণ করে কিছু কিছু ধাতুর যৌগ থেকে ধাতুকে আলাদা করা হয়। এইরকম তিনটি ধাতু হলো সোডিয়াম, পটাশিয়াম ও ক্যালশিয়াম। এদের ক্লোরাইড লবণগুলোকে গলিত অবস্থায় রেখে তড়িৎ বিশ্লেষণ করে ধাতুকে পাওয়া যায়। জলীয় দ্রবণ ব্যবহার করে এই পদ্ধতিতে সোডিয়াম, পটাশিয়াম বা ক্যালশিয়াম ধাতু তৈরি করা যায় না তাই গলিত ক্লোরাইড লবণ নেওয়া হয়।

(খ) ধাতু পরিশোধন : তামা (কপার) আমাদের অতি প্রয়োজনীয় ধাতু। প্রায় সমস্ত বৈদ্যুতিক যন্ত্রে তামার তার লাগে। তামার যৌগ থেকে প্রথমে যে তামা নিষ্কাশিত হয় তা অশুদ্ধ। অশুদ্ধিগুলোকে দূর না করলে তড়িৎ পরিবাহিতা কম হবে। তাহলে কী করা দরকার? অশুদ্ধিগুলোকে দূর করা। অশুদ্ধ কপারকে তড়িৎ বিশ্লেষণের সাহায্যে শুদ্ধ করা হয়।

(গ) তড়িৎ লেপন : তোমরা লক্ষ করে থাকবে বাড়ির চাল তৈরি করার জন্যে যে ঢেউ খেলানো ধাতব শিট (বা চাদর বা পাত) ব্যবহার করা হয় অথবা সাইকেলে বা রিকশায় যে হ্যান্ডেল, বেল, চাকার রিম লাগানো থাকে সেগুলো বেশ কিছুদিন ব্যবহার করলে তাদের চকচকে ভাব বা জৌলুস কমে যায়। এগুলোর নতুন অবস্থাতেও কোথাও একটু আঁচড়

লেগে গেলে ভেতর থেকে অপেক্ষাকৃত কম চকচকে একটা ধাতু বেরিয়ে পড়ে। এর কারণ কী?

এই জিনিসগুলো তৈরি করতে যে ধাতু ব্যবহার করা হয়েছে তাকে আবহাওয়ার বা আরো ভালোভাবে বলতে গেলে পরিবেশের বাতাস ও জলের হাত থেকে ধাতুকে রক্ষা করার জন্যে ও অপেক্ষাকৃত দীর্ঘস্থায়ী অন্য কোনো কম সক্রিয় ধাতুর একটা প্রলেপ দেওয়া থাকে। অন্য একটা কারণ হলো, জিনিসগুলোকে আমাদের চোখে আরো আকর্ষণীয় করে তোলা। একটা ধাতুর জিনিসের ওপর অন্য ধাতুর প্রলেপ দেবার জন্য তড়িৎ বিশ্লেষণ পদ্ধতির সাহায্য নেওয়া হয়। তাই একে আমরা তড়িৎ লেপন বলি।

কিন্তু কীভাবে করা হয় এই তড়িৎ লেপন

হাতেকলমে

একটা পরিষ্কার বিকারে কিছুটা পাতিত জল নিয়ে তার মধ্যে দু-চামচ তুঁতে ও কয়েক ফোঁটা লঘু সালফিউরিক অ্যাসিড মেশাও। এবার দুটো বা তিনটে সাধারণ সেল জুড়ে তৈরি ব্যাটারির ঋণাত্মক (—) প্রান্তের সঙ্গে একটা পরিষ্কার লোহার পেরেক তারের সাহায্যে জুড়ে দাও। ব্যাটারির ধনাত্মক (+) প্রান্তের সঙ্গে তার দিয়ে একটা পরিষ্কার ও খুব পাতলা তামার পাত যুক্ত করো। এবার লোহার পেরেক ও তামার পাত পাশের ছবির মতো করে তুঁতের দ্রবণে ডুবিয়ে 15-20 মিনিট ব্যাটারির সাহায্যে তড়িৎ চালনা করো। তারপর সাবধানে লোহার পেরেক ও তামার পাত দ্রবণ থেকে তুলে নিয়ে শুকনো করো। তারপর ভালো করে দুটোকেই লক্ষ করো। যা দেখলে তা লেখো।

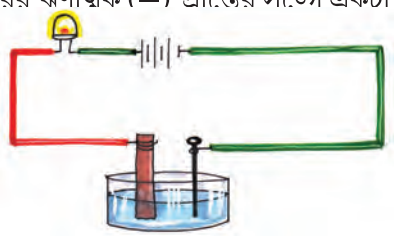

কোন জিনিসে	এখানে ক্যাথোড না অ্যানোড	কেমন পরিবর্তন ঘটেছে
লোহার পেরেক		
তামার পাত		

ভালো করে লক্ষ করলে দেখতে পাবে তুঁতের দ্রবণের মধ্যে লোহার পেরেকের যতটা অংশ ডোবানো ছিল সেই অংশে লালচে বাদামি রং-এর তামার একটা আস্তরণ তৈরি হয়েছে, যেটা আগে ছিল না।

এখানে কী ঘটল? লোহার পেরেকে (ক্যাথোডে) লালচে বাদামি আস্তরণ পড়ছে মানে সেখানে তামা তৈরি হয়েছে। দ্রবণের কিউপ্রিক আয়নগুলোই (Cu^{2+}) পেরেকের গায়ে এসে ইলেকট্রন নিয়ে তামার পরমাণু উৎপন্ন করেছে।

$$Cu^{2+} + 2e^- \rightarrow Cu \text{ (বিজারণ)}$$

খানিকক্ষণ তড়িৎ পাঠালে দেখতে পাবে তামার পাতটা একটু ক্ষয়ে যায়। কারণ তামার পাত থেকে কিছু Cu পরমাণু ইলেকট্রন ছেড়ে দ্রবণে কিউপ্রিক আয়ন (Cu^{2+}) হিসেবে এসেছে।

$$Cu \rightarrow Cu^{2+} + 2e^- \quad \text{(জারণ)}$$

তড়িৎ লেপনের সময় যে ধাতুর প্রলেপ দিতে হবে তাকে অ্যানোডরূপে আর যে বস্তুর উপরে প্রলেপ দিতে হবে তাকে ক্যাথোডরূপে ব্যবহার করতে হবে। যে ধাতুর প্রলেপ দিতে হয় তারই জলে দ্রাব্য কোনো যৌগের দ্রবণ তড়িৎ বিশ্লেষ্যরূপে ব্যবহার করতে হয়। অনেকেই ব্রোঞ্জ বা রুপোর তৈরি কিন্তু সোনার মতো দেখতে গয়না পরেন। চলতি কথায় আমরা এইসমস্ত গয়নাকে বলি সোনার-জল-করা। ভেবে দেখো তো — সোনার কি জল হয় বা সোনা কি জলে গুলে যায়? — এর কোনোটাই নয়। এগুলো হলো অন্য ধাতুর তৈরি গয়নাকে আকর্ষণীয়

করে তোলার জন্যে তড়িৎ লেপন পদ্ধতিতে তাদের ওপর সোনার একটা প্রলেপ দেওয়া। অনেক সময় সোনালি রং-এর রোল্ড-গোল্ড-এর গয়নার কথাও তোমরা শুনে থাকবে। আবার জলের পাইপ অথবা বাড়ির চাল তৈরির শীট তৈরির সময় লোহার মতো শক্ত ধাতু ব্যবহার করা হয়।

কিন্তু জল আর বাতাসের অক্সিজেনের সঙ্গে বিক্রিয়ায় লোহায় মরচে পড়ে। তাই তার ওপর অপেক্ষাকৃত কম ক্ষয় হয় এমন একটা ধাতু, জিঙ্ক (Zn)-এর প্রলেপ দেওয়া থাকে। একে বলে জিঙ্ক-প্রলিপ্ত বা গ্যালভানাইজড লোহা।

একইভাবে গাড়ি বা সাইকেলের লোহার তৈরি অংশ অথবা পিতলের তৈরি জলের কলের ওপর ক্রোমিয়ামের মতো চকচকে ধাতুর প্রলেপ দেওয়া থাকে যাতে সেগুলো আকর্ষণীয় ও দীর্ঘস্থায়ী হয়। লোহার তৈরি সেতুতে বা বাড়ির গ্রিল তৈরিতে ব্যবহার করা লোহার ওপরেও জিঙ্কের প্রলেপ দেওয়া হয় একই কারণে ।

লোহার যন্ত্রপাতি-বাসনপত্রকে মরচে ধরা থেকে বাঁচাতে তড়িৎ লেপনের সাহায্যে নিকেলের সূক্ষ্ম আস্তরণ দেওয়া হয়। এই আস্তরণ রুপোলি। একে স্টেইনলেস স্টিল বলে ভুল হতে পারে। কী করে চিনবে? নিকেল প্লেটিং করা জিনিস চুম্বক দিয়ে তীব্রভাবে আকৃষ্ট হয়, স্টেইনলেস স্টিলে তা হয় না। তাহলে দেখো, আমাদের পরিচিত অনেক জিনিসেই এই তড়িৎ লেপন প্রক্রিয়া কাজে লাগিয়ে বিভিন্ন ধাতুর প্রলেপ দেওয়া আছে, যার ভিতরে আসল ধাতুর তৈরি জিনিসটা বর্তমান।

তড়িৎ লেপন করা যে সমস্ত পরিচিত জিনিসের কথা আমরা জানলাম তা কীভাবে করা হয়? নীচের সারণিটা পূরণ করো। প্রয়োজনে শিক্ষক/শিক্ষিকার সাহায্য নাও।

কোন ধাতুর তৈরি কোন জিনিসের ওপর	কোন ধাতুর প্রলেপ দিতে হবে	এই কাজে কী ব্যবহার করা হবে	
		ক্যাথোড হিসেবে	অ্যানোড হিসেবে
লোহার পাইপ	জিঙ্ক		
লোহার তৈরি সাইকেলের হ্যান্ডেল	ক্রোমিয়াম		
পিতলের তৈরি জলের কল	ক্রোমিয়াম		
রুপোর তৈরি গয়না	সোনা	রুপোর গয়না	বিশুদ্ধ সোনার পাত
জার্মান সিলভারের তৈরি বাসনপত্র	রুপো		
লোহার চামচ	নিকেল		

পরীক্ষাগারে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতির পরিচিতি

পরীক্ষাগার হলো শিক্ষালয়ের সেই কক্ষ যেখানে বিজ্ঞানের (বা কখনো-কখনো ভূগোলের মতো অন্য বিষয়েরও) বিভিন্ন পরীক্ষানিরীক্ষা হাতেকলমে করার ব্যবস্থা থাকে। অবশ্য নতুন পাঠক্রমে শ্রেণিকক্ষকেই পরীক্ষাগারে পরিণত করে একইসঙ্গে শিক্ষণ-শিখন ও বিভিন্ন তত্ত্বের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা হাতেকলমে করা যায় এমন ব্যবস্থার কথা ভাবা হচ্ছে।

পাশের ছবিতে রসায়নাগারের মধ্যে অনেকরকম যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামের ছবি দেখা যাচ্ছে। এসো তাদের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কিছু সরঞ্জাম সম্পর্কে আমরা পরিচিত হই।

1. সাধারণ থার্মোমিটার : বিভিন্ন বস্তু বা পরীক্ষাধীন পদার্থ অথবা বায়ুমণ্ডলের উষ্ণতা মাপতে যে যন্ত্র ব্যবহার করা হয় তা হলো থার্মোমিটার। থার্মোমিটারের গায়ে যে দাগ কাটা থাকে তাকে তার স্কেল বলে। এই স্কেল সেন্টিগ্রেড, ফারেনহাইট বা কেলভিন এককে যেমন হতে পারে, তেমনি স্কেলের বিস্তারও (range) বিভিন্ন হতে পারে। যেমন— কোনো থার্মোমিটার 0^0C থেকে 100^0C পর্যন্ত হতে পারে, আবার কোনোটা 0^0C থেকে 200^0C হতে পারে, কোনোটা আবার 300^0C বা 350^0C পর্যন্ত হতে পারে।

2. তড়িৎ কোশ : এখন সাধারণত কোশ অর্থাৎ তড়িতের উৎস হিসাবে নির্জলকোশ ব্যবহার করা হয় (যাকে আমরা ভুল করে ব্যাটারি বলে থাকি)। দুই বা তার বেশি সংখ্যক প্রয়োজনমতো শক্তির নির্জলকোশ জুড়ে ব্যাটারি তৈরি করে নেওয়া হয়। লক্ষ করে থাকবে ব্যাটারির ওপরের দিকে যেখানে পিতলের একটা টুপি থাকে সেদিকের গায়ে '+' চিহ্ন ও নীচের সমতল দিকটার গায়ে (-) চিহ্ন দেওয়া থাকে। ব্যাটারি তৈরির সময় একাধিক নির্জলকোশের (+) ও (-) প্রান্ত ক্রমান্বয়ে থাকা জরুরি, নতুবা তড়িৎপ্রবাহ ঘটবে না।

3. সুইচ : তড়িৎ বর্তনীর একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো সুইচ, যা প্রয়োজনমতো তড়িৎপ্রবাহ চালু ও বন্ধ করতে পারে। সাধারণত যে দু-ধরনের সুইচ ব্যবহার করা হয় তা হলো — প্লাগ ধরনের ও টেপা ধরনের। আমাদের বাড়িতে যে

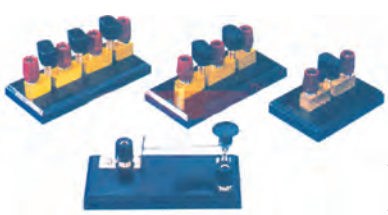

ধরনের সুইচ ব্যবহার হতে আমরা দেখি তাদের ক্রিয়াকৌশলও প্রায় একইরকম। তবে তা ভেতরের অংশে থাকায় বাইরে থেকে দেখা যায় না।

4. **তার :** পিভিসি জাতীয় পলিমার দিয়ে মোড়া (অন্তরিত) তামার সাধারণ তার দিয়েই বিভিন্ন সংযোগ করা হয়। এরজন্য বিভিন্ন মাপের তার ব্যবহৃত হয়।

5. বালব : কোনো তড়িৎ বর্তনীতে তড়িৎপ্রবাহ হচ্ছে কিনা তা জানার সবচেয়ে সহজ রাস্তা হলো বর্তনীতে একটা বালব যুক্ত করা। তাই এই কাজে প্রয়োজনীয় শক্তি অনুসারে বিভিন্ন ছোটো ছোটো বালব ব্যবহার করা হয়। এর বদলে LED-ও ব্যবহার করা যেতে পারে, কারণ বালবের থেকে এর আয়ু অনেক বেশি নাড়াচাড়াতে কেটে যাবার ভয় নেই।

6. রাসায়নিক তুলাযন্ত্র : রাসায়নিক তুলাযন্ত্র হলো কোনো নমুনা পদার্থের ঠিক ভর মাপার অথবা ঠিক ভরের পদার্থ নেবার জন্য ব্যবহৃত একটা যন্ত্র। এই তুলার সাহায্যে সামান্য ভরের পার্থক্যও মাপা যায়। এটাই সাধারণ তুলাযন্ত্রের সঙ্গে এই তুলাযন্ত্রের পার্থক্য। এই তুলার বাঁদিকের তুলাপাত্রে পদার্থের নমুনা ও ডানদিকে প্রয়োজনীয় ভরের বাটখারা চাপানো হয়। বাটখারা চাপানোর জন্য একটা চিমটে ব্যবহার করা হয়। কারণ হাতে ধরে বসালে বাটখারায় হাতের লেগে থাকা নোংরা বা ধুলো লেগে বাটখারার প্রকৃত ভর বেড়ে যেতে পারে।

7. ক্ল্যাম্প ও স্ট্যান্ড : বিভিন্ন পরীক্ষায় ধারক হিসাবে ভারী পাদদেশ বিশিষ্ট বিভিন্ন মাপের লোহার স্ট্যান্ড এবং বিভিন্ন মাপের ও আকৃতির ক্ল্যাম্প ব্যবহৃত হয়।

8. বুনসেন বার্নার ও স্পিরিট ল্যাম্প : এল পি জি ব্যবহার করে আগুনের উৎস হিসাবে বুনসেন বার্নার জ্বালানো হয়। গ্যাসের উৎস হিসাবে পেট্রোলিয়াম গ্যাস প্ল্যান্টের সাহায্যও কখনো-কখনো নেওয়া হয়। তবে খুব নির্দিষ্ট কিছু পরীক্ষা ছাড়া তাপের উৎস হিসাবে স্পিরিট ল্যাম্পের ব্যবহারই চালু ব্যবস্থা।

9. টেস্টটিউব বা পরীক্ষানল, গোলতল ফ্লাস্ক, কনিক্যাল ফ্লাস্ক, বিকার, উলফ বোতল, গ্যাসজার ও ওয়াচ গ্লাস: পরীক্ষাগারে ব্যবহার করা হয় নানা মাপের ও নানা আকৃতির কাচের তৈরি পাত্র। তাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করা হয় টেস্টটিউব বা পরীক্ষানল। এগুলো পাতলা কাচের তৈরি সরু একমুখ খোলা নল। তবে এর দেয়াল মোটা ও শক্ত কাচের হলে তাকে হার্ডগ্লাস টেস্টটিউব বলে। আবার কোনো রাসায়নিক বিক্রিয়ায় তরল পদার্থ বা কোনো দ্রবণ গরম করার জন্য একটা সরু গলার গোলাকার তলদেশের পাত্র ব্যবহার করা হয়। এগুলোকে বলে গোলতল ফ্লাস্ক। আবার শঙ্কু আকৃতির ছোটো গলার কাচপাত্রটা হলো কনিক্যাল ফ্লাস্ক।

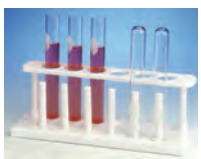

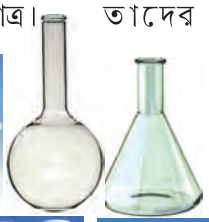

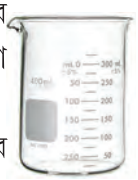

চোঙাকৃতির, মুখের কাছে একটু ছুঁচালো পাত্রটা হলো বিকার। আবার গ্যাস তৈরির জন্য দু-মুখবিশিষ্ট পাত্রটা হলো উলফ বোতল। এর একটা মুখে বিক্রিয়ক ঢালা যায়, আর অন্য মুখ দিয়ে গ্যাস বের হতে পারে। পরীক্ষাগারে তৈরি গ্যাস সংগ্রহ করা হয় চোঙাকৃতির, ঢাকনাবিশিষ্ট একটু বড়ো কাচপাত্রে; এর নাম গ্যাসজার। কোনো

পদার্থ বা কম পরিমাণ দ্রবণ অথবা ছোটো কোনো নমুনা রাখার জন্য একটু মোটা কাচের অনুচ্চ গোলাকার পাত্র হলো ওয়াচ গ্লাস।

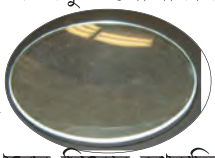

10. ফানেল: এটা একটা কাচনির্মিত সরঞ্জাম, যার ওপরটা শঙ্কু আকৃতির ও নীচে সরু নল লাগানো। নল প্রয়োজনমতো লম্বা হতে পারে। বেশি লম্বা নলযুক্ত ফানেলকে দীর্ঘনল ফানেল বলে। দীর্ঘনল ফানেলের ওপরের দিকের আকৃতি ছোটো কলশি বা ঘটির মতো হতে পারে।

11. টেস্টটিউব র‍্যাক : টেস্টটিউবে পরীক্ষণীয় নমুনা নিয়ে তা খাড়াভাবে বসিয়ে রাখার জন্যে কাঠের বা প্লাস্টিকের র‍্যাক ব্যবহার করা হয়।

12.টেস্টটিউব হোল্ডার: পরীক্ষা করার সময় টেস্টটিউব যাতে হাত দিয়ে ধরতে না হয় তাই পাতলা পাতের তৈরি সাঁড়াশির মতো এই সরঞ্জাম ব্যবহার করা হয়।

13. মাপক চোং : তরল পদার্থের আয়তন মাপার জন্যে বিভিন্ন মাপের মাপক চোং ব্যবহার করা হয়। যেমন — 50 mL, 100 mL , 200 mL , 500 mL ইত্যাদি।

14. ত্রিপদ স্ট্যান্ড ও তারজালি : কোনো পাত্রকে গরম করার সময় তিনপায়া বিশিষ্ট ঢালাই লোহার স্ট্যান্ডের ওপর তা বসানো হয়। ত্রিপদ স্ট্যান্ডের ওপরের বৃত্তাকার রিং-এর থেকে পাত্রের মাপ ছোটোও হতে পারে। তাই ত্রিপদ স্ট্যান্ডের ওপর পাত্র বসানোর সময় মাঝখানে লোহার তারজালি ব্যবহার করা হয়। অনেক সময় তারজালির মাঝখানে বৃত্তাকারে অ্যাসবেসটসের প্রলেপ দেওয়া থাকে, যাতে এর ওপরে রাখা পাত্র সমানভাবে উত্তপ্ত হতে পারে।

15. কাচনল ও কাচদণ্ড: গ্যাস প্রস্তুতি বা অন্যান্য পরীক্ষার সময় নানা মাপের সোজা অথবা বাঁকা কাচনল কাজে লাগে। সোজা কাচনলকে বুনসেন বার্নারের শিখায় বাঁকিয়েও প্রয়োজনমতো বাঁকা কাচনল তৈরি করে নেওয়া যায়। কোনো মিশ্রণ বা দ্রবণ তৈরি করার সময় নাড়ানোর জন্যে বিভিন্ন মাপের সরু বা মোটা কাচদণ্ড ব্যবহার করা হয়।

16. পিপেট ও ব্যুরেট: প্রশমন বা টাইট্রেশান পরীক্ষার জন্যে নির্দিষ্ট আয়তনের বিক্রিয়ক তরল নেওয়া ও তার প্রশমনের জন্যে প্রয়োজনীয় তরলের সঠিক আয়তন জানার জন্যে যথাক্রমে পিপেট ও ব্যুরেট ব্যবহার করা হয়। সাধারণ ব্যুরেটে 0 mL থেকে 50 mL পর্যন্ত দাগ কাটা থাকে ও তরল নির্গমন নিয়ন্ত্রণ করার জন্যে নীচে একটা স্টপককের মতো অংশ থাকে। সাধারণ পিপেটের মাঝখানে একটা স্ফীত অংশ থাকে ও ওপরের দিকে নির্দিষ্ট আয়তন নির্দেশ করার জন্যে একটা বলয়াকৃতি সরু দাগ কাটা থাকে। পিপেট 2 mL , 5 mL , 10 mL , 25 mL ইত্যাদি বিভিন্ন মাপের হতে পারে।

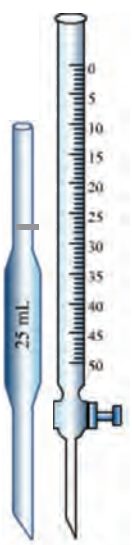

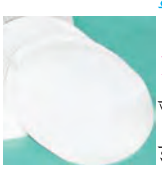

17. ফিলটার কাগজ : কোনো তরলে যদি অদ্রাব্য কঠিন পদার্থ মিশে থাকে তবে তাদের পৃথক করার জন্য গোলাকার একটু মোটা ধরনের যে কাগজ ব্যবহার করা হয় সেটাই ফিলটার কাগজ।

অক্সিজেন

অক্সিজেন এল কোথা থেকে?

নানা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সাক্ষ্য প্রমাণের ভিত্তিতে বিজ্ঞানীরা মনে করেন যে আজ থেকে প্রায় 450 কোটি (4.5 বিলিয়ন) বছর আগে পৃথিবী সৃষ্টি হয়েছিল। পৃথিবীতে প্রাণের সৃষ্টি হয়েছিল আনুমানিক 350 কোটি বছর আগে। তখনকার বাতাসে অক্সিজেনের পরিমাণ ছিল আজকের তুলনায় খুবই কম। বাতাসে বরং তার চেয়ে অনেক বেশি ছিল হাইড্রোজেন, অ্যামোনিয়া, নাইট্রোজেন, কার্বন ডাইঅক্সাইড, হাইড্রোজেন সালফাইড, মিথেন। আজকের পৃথিবীতে অনেক বায়ুজীবী (aerobic) জীবাণু আছে যারা অক্সিজেনকে কাজে লাগিয়ে বেঁচে থাকতে পারে। তখনকার জীবাণুরা কিন্তু তা পারত না, তারা ছিল অবায়ুজীবী (anaerobic)। বেঁচে থাকার শক্তি তারা অন্যভাবে পেত। এইভাবে চলে গেল বহু কোটি বছর।

আজ থেকে প্রায় দুশো পঞ্চাশ কোটি বছর আগে পৃথিবীর সমুদ্রে দেখা যেতে লাগল একধরনের জীবাণু, বিজ্ঞানীরা যাদের নাম দিয়েছেন সায়ানোব্যাকটেরিয়া। সূর্যের আলো আর বিশেষ ধরনের প্রোটিনের সাহায্যে এরাই জলকে ভেঙে তৈরি করতে লাগল অক্সিজেন গ্যাস। ধীরে ধীরে পৃথিবীর বাতাসে অক্সিজেনের পরিমাণ বাড়তে লাগল। আজও জলা জায়গায় (পুকুরের জলে, ধানক্ষেতে) সায়ানোব্যাকটেরিয়া দেখা যায়। আরো পরে এল সবুজ শৈবাল ও অন্যান্য উদ্ভিদ। তারাও সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় অক্সিজেন তৈরি করতে শুরু করল। কোটি কোটি বছর ধরে বাতাসে অক্সিজেনের আনুপাতিক পরিমাণ বাড়তে বাড়তে এক সময় তা আজকের অবস্থায় পৌঁছোল।

বাতাসে অক্সিজেন থাকার কী সুবিধে ?

অক্সিজেন কাজে না লাগালে কোশে গ্লুকোজ থেকে যতটা শক্তি পাওয়া যায়, অক্সিজেন কাজে লাগালে তার পনেরো গুণেরও বেশি শক্তি পাওয়া সম্ভব। বেশি শক্তি পাওয়ার অর্থ নানাধরনের কাজ করার ক্ষমতা পাওয়া। বাতাসে অক্সিজেন বৃদ্ধি পাবার পর পৃথিবীতে অক্সিজেন কাজে লাগাতে পারে এমন নানা জীব (উদ্ভিদ ও প্রাণী) সৃষ্টি হলো।

পৃথিবীতে সব জীবেরই কী অক্সিজেন লাগে ?

জলাভূমির কাদার গভীরে বা শহরের নোংরা জলনিকাশি নালার পাঁকের নীচে অক্সিজেন ঢুকতে পারে না। এইসব জায়গায় এমন কিছু ব্যাকটেরিয়া থাকে যাদের অক্সিজেনে আনলেই মরে যায়। এদের বলে বাধ্যতামূলক অবায়ুজীবী। এদের কোশে শক্তি তৈরির রাসায়নিক বিক্রিয়াগুলো অক্সিজেন ব্যবহারকারী জীব-কোশের মতো নয়। বিভিন্ন অবায়ুজীবী ব্যাকটেরিয়া ও অবায়ুজীবী কিছু ছত্রাক বাদ দিলে পৃথিবীতে এখন বায়ুজীবীদেরই প্রাধান্য। মানুষসহ অন্যান্য প্রাণী ও উদ্ভিদ সকলেই বায়ুজীবী, সকলেরই অক্সিজেন লাগে।

অক্সিজেনের কী শুধুই সুবিধে না সমস্যাও আছে ?

অক্সিজেন থাকলে খাদ্য থেকে কোশে বেশি শক্তি পাওয়া যাবে ঠিকই, কিন্তু কিছু অসুবিধেও আছে। অক্সিজেনকে কাজে লাগিয়ে শক্তি তৈরির সময় কোশে এমন কিছু কিছু জিনিস তৈরি হয় যারা অল্প পরিমাণে থাকলেও কোশের অনেক ক্ষতি করতে পারে। যেমন হাইড্রোজেন পারক্সাইড (H_2O_2) বা সুপার অক্সাইড আয়ন (O_2^-)। এথেকে আরও ক্ষতিকারক পদার্থ তৈরি হয়ে কোশের ডিএনএ অণুর অনেক ক্ষতি করতে পারে।

এই সমস্যা থেকে কোশ বাঁচবে কী করে ?

সুপারঅক্সাইড বা হাইড্রোজেন পারক্সাইডকে নষ্ট করে দিতে বিভিন্ন জীবকোশে বিশেষ বিশেষ এনজাইম থাকে। যেমন ধরো ক্যাটালেজ এনজাইম। ক্যাটালেজ হাইড্রোজেন পারক্সাইডকে ভেঙে জল আর অক্সিজেন তৈরি করে ($2H_2O_2 \xrightarrow{\text{ক্যাটালেজ}} 2H_2O + O_2$)।

খাদ্য থেকে শক্তি তৈরি আর জ্বালানি দহন ছাড়া আর কী কাজে লাগে অক্সিজেন?

রাসায়নিক শিল্পে অক্সিজেন খুবই দরকারি মৌল। তোমরা জানো যে আজকের সভ্যতা ইস্পাত ছাড়া অচল—বাড়ি, ব্রিজ, যানবাহন, যন্ত্রপাতি, রেললাইন, অস্ত্রশস্ত্র—সবকিছু তৈরিতে লাগে নানাধরনের ইস্পাত। ইস্পাত তৈরিতে ভালো মানের লোহা চাই, অশুদ্ধ লোহায় খুব তাড়াতাড়ি মরচে ধরে। অশুদ্ধ লোহার অশুদ্ধি দূর করে প্রত্যেক বছর কোটি কোটি টন ইস্পাত তৈরি করতে অক্সিজেন চাই।

তোমরা যেসব অ্যাসিড আর সারের কথা জেনেছ তার মধ্যে অন্যতম দুটো হলো নাইট্রিক অ্যাসিড (HNO_3) আর অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট (NH_4NO_3)। নাইট্রিক অ্যাসিড তৈরিতে অক্সিজেন অপরিহার্য, আর অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট তৈরি হবে নাইট্রিক অ্যাসিড থেকেই। বিস্ফোরক তৈরিতেও নাইট্রিক অ্যাসিড চাই।

সালফিউরিক অ্যাসিড (H_2SO_4) হলো সবচেয়ে দরকারি অ্যাসিড — গাড়ির ব্যাটারি, রং, সার তৈরি, পেট্রোলিয়াম পরিশোধন, তামা, জিঙ্ক ধাতুর পরিশোধন — এসব কাজে সালফিউরিক অ্যাসিড চাই। সালফিউরিক অ্যাসিড তৈরির সবচেয়ে দরকারি ধাপে অক্সিজেন লাগে।

নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত ব্যক্তির চিকিৎসায় শতকরা 5 ভাগ কার্বন ডাইঅক্সাইড মিশ্রিত অক্সিজেন (কার্বোজেন) ব্যবহৃত হয়। এছাড়া শ্বাসকষ্ট উপশমে নিয়ন্ত্রিত মাত্রায় অক্সিজেন গ্যাস দেওয়া হয়।

প্রত্যেক বছর তাহলে যে কোটি কোটি টন অক্সিজেন লাগে তা আমরা পাব কোথায়? নিশ্চয়ই সস্তার কোনো উৎস থেকেই? শিল্পের প্রয়োজনীয় অক্সিজেন আমরা জোগাড় করি বাতাস থেকে। এটাই সবচেয়ে সুলভ উৎস।

তোমরা শিক্ষক/শিক্ষিকার সঙ্গে আলোচনা করো জীবমণ্ডল ও বায়ুমণ্ডলের মধ্যে কী কী উপায়ে অক্সিজেনের আদান-প্রদান হয় এবং কোন প্রাণী কীভাবে বায়ুমণ্ডল থেকে অক্সিজেন গ্রহণ করে।

অক্সিজেনের ভৌত ধর্ম

আমাদের পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে আয়তন হিসাবে প্রায় 20.6 শতাংশ অক্সিজেন আছে। অধিকাংশ জীব তার শ্বাসকার্যের জন্য বায়ু বা জল থেকে অক্সিজেন গ্রহণ করে। তাই অক্সিজেন আমাদের কাছে খুবই পরিচিত একটা গ্যাসের নাম। কিন্তু সাধারণ কয়েকটা ভৌত ধর্ম অর্থাৎ বাইরে থেকেই কি অক্সিজেন গ্যাসকে চেনা সম্ভব?

অক্সিজেনের কয়েকটা ভৌত ধর্ম হলো—

1. এটি বর্ণহীন, গন্ধহীন, স্বাদহীন, সাধারণ উষ্ণতায় গ্যাসীয় পদার্থ।
2. বাতাসের চেয়ে সামান্য ভারী; প্রমাণ উষ্ণতা ও চাপে এর ঘনত্ব 1.428 গ্রাম প্রতি লিটার।
3. জলে সামান্য দ্রাব্য; প্রমাণ চাপে 0°C উষ্ণতায় বিশুদ্ধ জলে অক্সিজেনের দ্রাব্যতা 14.6 মিলিগ্রাম / লিটার।
4. তরল অক্সিজেনের হিমাঙ্ক —218° C এবং তরল অক্সিজেনের স্ফুটনাঙ্ক -183° C , যদিও এই উষ্ণতা দুটি সাধারণ কোনো পরীক্ষায় নির্ণয় করা সম্ভব নয়।

   ঘনীভূত হলে-183° C উষ্ণতায় অক্সিজেন হালকা নীল রং-এর তরলে পরিণত হয়। তরল হাইড্রোজেন ব্যবহার করে কঠিন করলে অক্সিজেন নীল রঙের কঠিন অবস্থা লাভ করে।
5. অক্সিজেনের তিনটি আইসোটোপ হলো $^{16}_{8}O$, $^{17}_{8}O$ এবং $^{18}_{8}O$, যদিও প্রকৃতিতে শেষ দুটির পরিমাণ খুবই কম।

অক্সিজেনের রাসায়নিক ধর্ম

1. অক্সিজেন অণু দ্বি-পরমাণুক, কিন্তু উচ্চ উষ্ণতায় অক্সিজেন অণু ভেঙে পারমাণবিক অক্সিজেন উৎপন্ন হয়। এই পারমাণবিক অক্সিজেন খুবই শক্তিশালী জারক।

$$O_2 \rightarrow O + O - \text{তাপ}$$

2. **অক্সিজেন গ্যাসের রাসায়নিক সক্রিয়তা :** অক্সিজেন সক্রিয় মৌল। বেশি উষ্ণতায় এবং অনুঘটকের উপস্থিতিতে এর সক্রিয়তা আরও বেড়ে যায়। দেখা গেছে যে নিষ্ক্রিয় মৌল, সোনা, প্ল্যাটিনাম প্রভৃতি নোবল মেটাল, ক্লোরিন, ব্রোমিন, আয়োডিন ছাড়া প্রায় সমস্ত মৌলের সঙ্গেই অক্সিজেন প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত হয়ে যৌগ গঠন করে।

3. অক্সিজেন নিজে দাহ্য নয়, কিন্তু বেশিরভাগ ধাতু ও অধাতুর সঙ্গে অক্সিজেন যুক্ত হবার সময় তাপ ও আলো উৎপন্ন হয়— এরকম বিক্রিয়াকেই দহন বলা হয়। দহনের ফলে দাহ্য পদার্থগুলোর কীরকম পরিবর্তন হয়?

দহনে দাহ্য পদার্থগুলো বা তার এক বা একাধিক উপাদান অক্সিজেনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে জারিত হয়।

হাতেকলমে

একটা শিখাহীন জ্বলন্ত পাটকাঠি অক্সিজেনপূর্ণ গ্যাসজারের মধ্যে সাবধানে প্রবেশ করাও। কী দেখলে তা লেখো।

কী দেখলে	কেন এমন হলো বলে মনে হয়

4. **শ্বাসকার্য :** জীবের শ্বাসকার্যে অক্সিজেনের ভূমিকা সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। অল্প কিছু নিম্নশ্রেণির জীব ছাড়া সমস্ত উদ্ভিদ ও প্রাণী শ্বাসকার্যের সময় পরিবেশ থেকে অক্সিজেন নেয় ও কার্বন ডাইঅক্সাইড ছেড়ে দেয়। শর্করা জাতীয় খাদ্যের সরলীকৃত উপাদান গ্লুকোজ থেকে নানান রাসায়নিক পরিবর্তনের মাধ্যমে জারণ ঘটে শক্তি উৎপন্ন হয়। এর ফলেই শরীরের জন্য প্রয়োজনীয় তাপ ও শক্তি উৎপন্ন হয়। গ্লুকোজ ($C_6H_{12}O_6$) থেকে জারণের মাধ্যমে শক্তি উৎপন্ন হওয়ার সামগ্রিক সমীকরণ হলো

$$C_6H_{12}O_6 + 6O_2 \rightarrow 6CO_2 + 6H_2O + \text{তাপ}$$

লক্ষ করে থাকবে কেউ অসুস্থ হয়ে শ্বাসকষ্ট হলে তাঁকে অক্সিজেন সিলিন্ডার থেকে অক্সিজেন দেওয়া হয়। আবার জিওল মাছ ডাঙাতেও দিব্যি বেঁচে থাকে তাদের অতিরিক্ত শ্বাসযন্ত্রের জন্য।

5. **অক্সাইড গঠন :** অধিকাংশ ধাতু ও অধাতুর সঙ্গে অক্সিজেন সরাসরি যুক্ত হতে পারে এটা আমরা আগেই জেনেছি। এর ফলে যে যৌগ উৎপন্ন হয় তাদের সংশ্লিষ্ট মৌলের অক্সাইড বলা হয়। কিন্তু অক্সিজেনের সঙ্গে সব মৌলই কি একই ধরনের যৌগ গঠন করে?— না, মৌলের প্রকৃতির উপর নির্ভর করে তার অক্সিজেনঘটিত যৌগ বিভিন্ন প্রকৃতির হতে পারে — আম্লিক অক্সাইড, ক্ষারকীয় অক্সাইড, উভধর্মী অক্সাইড, পারক্সাইড ইত্যাদি।

(i) অধাতুর সঙ্গে অক্সিজেনের বিক্রিয়া (আম্লিক অক্সাইড গঠন) :

হাতেকলমে : একটা প্রজ্বলন বা দহন চামচে একটুকরো কাঠকয়লা (কার্বন) রেখে লাল হওয়া পর্যন্ত গরম করে অক্সিজেনপূর্ণ একটা গ্যাসজারে পাশের ছবির মতো করে ঢুকিয়ে দাও। গ্যাসজারের ভিতরে কী ঘটছে দেখো। জারটা ঠান্ডা হলে গ্যাসজারের মুখে একটা ভিজে নীল লিটমাস ও একটা ভিজে লাল লিটমাস কাগজ ধরে দেখো তাদের রং কেমন হয়। এবার গ্যাসজারের মধ্যে স্বচ্ছ চুনজল ঢেলে ভালো করে ঝাঁকিয়ে দেখো চুনজলের কোনোরকম পরিবর্তন হলো কি? যা দেখলে তা নীচে লেখো :

কী করলে	কী দেখতে পেলে	কেন এমন হলো বলে মনে হয়
(i) যখন লাল হয়ে যাওয়া কাঠকয়লা অক্সিজেনপূর্ণ গ্যাসজারের মধ্যে ঢুকিয়ে দিলে		
(ii) তারপর গ্যাসজারের মুখে ভিজে নীল ও লাল লিটমাস কাগজ ধরলে		
(iii) গ্যাসজারের মধ্যে স্বচ্ছ চুনজল দিয়ে ঝাঁকালে		

সম্ভব হলে সামান্য সালফার গুঁড়ো বা ফসফরাস নিয়ে দহনের পরে ভিজে লিটমাস দিয়ে পরীক্ষা করা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে শিক্ষক/শিক্ষিকার সাহায্য নিতে হবে।

ওপরে উল্লেখিত অধাতব মৌলগুলো পর্যাপ্ত অক্সিজেনে দহনের সময় নীচের অক্সাইডগুলো তৈরি করে।

$C + O_2 \rightarrow CO_2$ $\qquad$ $S + O_2 \rightarrow SO_2$ $\qquad$ $P_4 + 5O_2 \rightarrow P_4O_{10}$

অবশ্য কম পরিমাণ অক্সিজেনের উপস্থিতিতে ও অপেক্ষাকৃত কম উষ্ণতায় কার্বন পুড়ে মূলত কার্বন মনোক্সাইড গ্যাস উৎপন্ন হয় ($2C + O_2 = 2CO$)।

ওপরের বিক্রিয়াগুলোয় উৎপন্ন অক্সাইড (CO_2, SO_2 , P_4O_{10})জলের সঙ্গে বিক্রিয়ায় অ্যাসিড উৎপন্ন করে। তাই এই অক্সাইডগুলোকে আম্লিক অক্সাইড বলা হয়।

$$CO_2 + H_2O \rightarrow H_2CO_3 \qquad SO_2 + H_2O \rightarrow H_2SO_3$$

ওপরের বিক্রিয়াগুলোর সমীকরণ দেখে ও নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে নীচের সারণি পূরণ করো। প্রয়োজনে শিক্ষক/শিক্ষিকার সাহায্য নাও।

মৌলের নাম	পর্যাপ্ত অক্সিজেনের সঙ্গে বিক্রিয়ায় উৎপন্ন অক্সাইডের নাম ও সংকেত	জলের সঙ্গে উৎপন্ন অক্সাইডের বিক্রিয়ায় তৈরি হওয়া অ্যাসিডের নাম ও সংকেত
কার্বন		
সালফার		

(ii) ধাতুর সঙ্গে অক্সিজেনের বিক্রিয়া :

(a) ক্ষারকীয় অক্সাইড গঠন : একটা ম্যাগনেশিয়াম ধাতুর ফিতে নিয়ে তাতে আগুন ধরাও। দেখতে পাবে যে ম্যাগনেশিয়াম ফিতেটা ফুলঝুরির মতো উজ্জ্বল আলো ছড়িয়ে জ্বলছে। নীচে যে সাদা সাদা গুঁড়ো পড়ছে তা

সংগ্রহ করে পাতিত জলের মধ্যে ভালো করে ঝাঁকাও। উৎপন্ন মিশ্রণে নীল ও লাল লিটমাস কাগজ ডোবাও, যা দেখলে তা নীচে লেখো :

কোন লিটমাসের রং	কী হল	জলীয় মিশ্রণের প্রকৃতি কেমন
নীল লিটমাস		
লাল লিটমাস		

এখানে ম্যাগনেশিয়াম ফিতে অক্সিজেনের উপস্থিতিতে দহনের ফলে সাদা গুঁড়োর মতো ম্যাগনেশিয়াম অক্সাইড উৎপন্ন করে। এই অক্সাইড জলের সঙ্গে বিক্রিয়া করে ক্ষারকীয় ধর্ম প্রকাশ করে। তাই এটি ক্ষারকীয় অক্সাইড।

$$2Mg + O_2 \rightarrow 2MgO \qquad MgO + H_2O \rightarrow Mg(OH)_2$$

একইভাবে লিথিয়াম, ক্যালশিয়াম প্রভৃতি ধাতু অক্সিজেনের সঙ্গে বিক্রিয়া করে যে অক্সাইড উৎপন্ন করে সেগুলোও পরীক্ষা করলে দেখা যাবে তারা ক্ষারকীয় প্রকৃতির।

$$2Ca + O_2 \rightarrow 2CaO \qquad CaO + H_2O \rightarrow Ca(OH)_2$$

(b) উভধর্মী অক্সাইড গঠন : অ্যালুমিনিয়াম ও জিঙ্ক ধাতু অক্সিজেনের সঙ্গে বিক্রিয়ায় যথাক্রমে অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড ও জিঙ্ক অক্সাইড উৎপন্ন করে।

$$4Al + 3O_2 \rightarrow 2Al_2O_3 \qquad 2Zn + O_2 \rightarrow 2ZnO$$

দেখা যায় এই অক্সাইডগুলো অ্যাসিড ও ক্ষার দু-ধরনের যৌগের সঙ্গেই বিক্রিয়া করে লবণ ও জল উৎপন্ন করতে পারে।

$$Al_2O_3 + 6HCl \rightarrow 2AlCl_3 + 3H_2O$$

অ্যালুমিনিয়াম ক্লোরাইড

$$Al_2O_3 + 2NaOH \rightarrow 2NaAlO_2 + H_2O$$

সোডিয়াম অ্যালুমিনেট

অ্যাসিড ও ক্ষার উভয় ধরনের যৌগের সঙ্গে প্রশমন বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে বলে এদের উভধর্মী অক্সাইড বলে। জিঙ্ক ও লেডের অক্সাইডও অ্যাসিড ও ক্ষার উভয়ের সঙ্গে বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে। জিঙ্ক অক্সাইডের সঙ্গে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড ও কস্টিক সোডার বিক্রিয়ার সমীকরণ নীচের সারণিতে লেখো। প্রয়োজনে শিক্ষক/শিক্ষিকার সাহায্য নাও।

ধাতু	অক্সাইড গঠন বিক্রিয়ার সমীকরণ	HCl দ্রবণের সঙ্গে বিক্রিয়ার সমীকরণ	NaOH দ্রবণের সঙ্গে বিক্রিয়ার সমীকরণ
জিঙ্ক			$2NaOH + ZnO \rightarrow Na_2ZnO_2 + H_2O$ সোডিয়াম জিঙ্কেট

(C) পারক্সাইড গঠন : উত্তপ্ত অবস্থায় সোডিয়ামের সঙ্গে অতিরিক্ত অক্সিজেনের বিক্রিয়ায় প্রধানত সোডিয়াম পারক্সাইড উৎপন্ন হয়।

$$2Na + O_2 \rightarrow Na_2O_2$$

এই যৌগগুলোকে পারক্সাইড বলার কারণ কী? — এদের মধ্যে পারক্সো (– O – O –) বন্ধন থাকে এবং এরা জলের সঙ্গে বিক্রিয়ায় হাইড্রোজেন পারক্সাইড (H_2O_2) উৎপন্ন করে।

বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে অক্সিজেন কিছু অন্য ধরনের যৌগ (সুপার অক্সাইড) উৎপন্ন করে।

6. জারণ ক্রিয়া : বর্ণহীন নাইট্রিক অক্সাইড অক্সিজেনের সংস্পর্শে জারিত হয়ে বাদামি রং-এর নাইট্রোজেন ডাইঅক্সাইড উৎপন্ন করে।

$$2NO + O_2 \rightarrow 2NO_2$$

হাতেকলমে

একটা টেস্টটিউবে কপারের ছিবড়ে রেখে তার মধ্যে পাতিত জল মিশিয়ে 1 : 1 আয়তন অনুপাতে তৈরি করা নাইট্রিক অ্যাসিড দ্রবণ যোগ করো। এবার টেস্টটিউবটাকে গরম করো। যে বর্ণহীন গ্যাস উৎপন্ন হলো তা অক্সিজেনপূর্ণ গ্যাসজারের মধ্যে প্রবেশ করাও। কী ঘটতে দেখলে তা নীচে লেখো। এই পরীক্ষা করার সময় অবশ্যই শিক্ষক/শিক্ষিকার সাহায্য নাও।

কী করলে	কী দেখলে

এখানে কপার ছিবড়ের সঙ্গে নাইট্রিক অ্যাসিডের বিক্রিয়ায় বর্ণহীন নাইট্রিক অক্সাইড গ্যাস উৎপন্ন হয়, যা অক্সিজেন দ্বারা জারিত হয়ে বাদামি রং-এর নাইট্রোজেন ডাইঅক্সাইডে পরিণত হয়।

$$3Cu + 8HNO_3 \rightarrow 3Cu(NO_3)_2 + 2NO + 4H_2O$$

$$2NO + O_2 \rightarrow 2NO_2$$

একটা টেস্টটিউবে সামান্য লঘু সালফিউরিক অ্যাসিড মেশানো ফিকে সবুজ রঙের ফেরাস সালফেট দ্রবণ নাও। তার মধ্যে অক্সিজেন গ্যাস পাঠাও। কিছুক্ষণ পর দেখবে দ্রবণের বর্ণ হলুদ হয়ে গেল।

$$4FeSO_4 + 2H_2SO_4 + O_2 \rightarrow 4Fe_2(SO_4)_3 + 2H_2O$$

7. অক্সিজেনের শোষক :

(i) সাধারণ বা কম উষ্ণতায় Au, Ag, Pt, Pd প্রভৃতি অক্সিজেনকে অধিশোষণ করে অর্থাৎ ধাতবপৃষ্ঠে দুর্বলভাবে আটকে রাখে। ধাতুগুলোকে আবার গরম করলে O_2 বেরিয়ে যায়।

(ii) ক্ষারীয় পটাশিয়াম পাইরোগ্যালেট দ্রবণ O_2-কে শোষণ করে বাদামি বর্ণ ধারণ করে।

(iii) অ্যামোনিয়াযুক্ত কিউপ্রাস ক্লোরাইড দ্রবণ O_2 গ্যাসকে দ্রুত শোষণ করে নীল বর্ণ ধারণ করে।

অক্সিজেন (O_2) গ্যাস প্রস্তুতি

হাইড্রোজেন পারক্সাইড থেকে অক্সিজেন (O_2) গ্যাস প্রস্তুতি

প্রয়োজনীয় দ্রব্য : (i) হাইড্রোজেন পারক্সাইড (H_2O_2)-এর লঘু দ্রবণ, (ii) ম্যাঙ্গানিজ ডাইঅক্সাইড (MnO_2), (iii) একটি মোমবাতি, (iv) পাটকাঠি, (v) একটি টেস্টটিউব, (vi) একটি টেস্টটিউব আটকাবার ক্ল্যাম্প

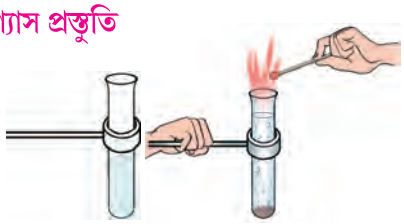

কী করলে	কী দেখলে	কী শিখলে
একটা টেস্টটিউবকে ক্ল্যাম্পের সাহায্যে ছবির মতো করে আটকাও। এবার টেস্টটিউবের মধ্যে হাইড্রোজেন পারক্সাইড ঢালো। তোমার পর্যবেক্ষণ লিখে ফেলো। এই হাইড্রোজেন পারক্সাইডে সামান্য একটু MnO_2 মেশাও এবং একটি শিখাহীন জ্বলন্ত পাটকাঠি টেস্টটিউবের মুখে ধরো। কী দেখলে?	হাইড্রোজেন পারক্সাইডে MnO_2 দেওয়ার আগে কী দেখলে? _____ MnO_2 যোগ করার পর কী দেখলে? _____	বিক্রিয়াটির সমীকরণ সম্পূর্ণ করে সমতা বিধান করো। $2H_2O_2 \rightarrow 2H_2O +$ ____ তুমি যা বুঝলে তা লেখো। _____ _____ _____

সোডিয়াম পারক্সাইড (Na_2O_2) থেকে অক্সিজেন (O_2) গ্যাস প্রস্তুতি

প্রয়োজনীয় দ্রব্য : (i) সোডিয়াম পারক্সাইড (Na_2O_2), (ii) জল (H_2O), (iii) কনিক্যাল ফ্লাস্ক, (iv) ফ্লাস্কের মুখে দুটি ছিদ্রযুক্ত ছিপি, (v) বিন্দুপাতি ফানেল, (vi) কাচের বাঁকানো নির্গমনল, (vii) গ্যাসজার।

কী করা হয়	কী দেখা যায়	সিদ্ধান্ত
একটা কনিক্যাল ফ্লাস্কের মুখে কর্কের মধ্যে দিয়ে বিন্দুপাতি ফানেল এবং একটা বাঁকানো নির্গমনল ছবির মতো করে আটকানো হয়। নির্গমনলের অপর প্রান্ত গ্যাসদ্রোণির সাহায্যে একটা জলপূর্ণ গ্যাসজারে প্রবেশ করানো হয়। কনিক্যাল ফ্লাস্কে কঠিন সোডিয়াম পারক্সাইড এবং বিন্দুপাতি ফানেলে জল নেওয়া হয়। এবার বিন্দুপাতি ফানেল থেকে ফোঁটা ফোঁটা করে জল সোডিয়াম পারক্সাইডের উপর ফেলা হয়।	গ্যাসজারের মধ্যে কী ঘটনা ঘটল? _____ _____	বিক্রিয়ার সমীকরণে শূন্যস্থান পূর্ণ করে সমতা-বিধানের মাধ্যমে উৎপন্ন গ্যাসটি কী তা লেখো। $Na_2O_2 + H_2O \rightarrow 2NaOH +$ ____ এই পরীক্ষার জন্য বাইরে থেকে তাপ দিতে হয় কী? _____

জলের তড়িৎ বিশ্লেষণের সাহায্যে অক্সিজেন (O_2) প্রস্তুতি

আমরা আগেই দেখেছি যে সামান্য খাবার নুন অথবা অ্যাসিড মেশানো জলের মধ্যে দিয়ে ব্যাটারির সাহায্যে তড়িৎ পাঠালে জলের তড়িৎ বিশ্লেষণ ঘটে। আর সেই সঙ্গে ক্যাথোডে হাইড্রোজেন গ্যাস ও অ্যানোডে অক্সিজেন গ্যাস উৎপন্ন হয়। অ্যানোডে তৈরি হওয়া গ্যাসটাকে আবদ্ধ পাত্রে সংগ্রহ করেও অক্সিজেন প্রস্তুত করা যায়। কীভাবে এই গ্যাস সংগ্রহ করবে? ছবি দেখে বোঝার চেষ্টা করো।

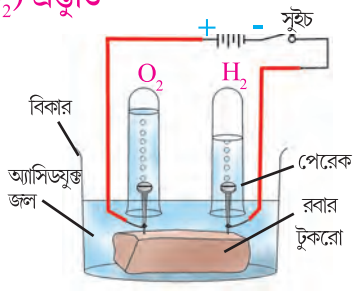

পরীক্ষাগারে পটাশিয়াম ক্লোরেট থেকে অক্সিজেন (O_2) গ্যাস প্রস্তুতি প্রণালী

দুটো শক্ত কাচের টেস্টটিউব নিয়ে একটার মধ্যে কিছুটা পটাশিয়াম ক্লোরেট নেওয়া হলো। অন্য টেস্টটিউবে পটাশিয়াম ক্লোরেটের সঙ্গে কিছুটা ম্যাঙ্গানিজ ডাইঅক্সাইড মেশানো হলো। দুটো টেস্টটিউবকেই বালিপাত্রে বসিয়ে 230°C উষ্ণতায় উত্তপ্ত করে টেস্টটিউব দুটোর মুখে জ্বলন্ত পাটকাঠি ধরলে দেখা যাবে প্রথমটার মুখে তা জ্বলছে না। কিন্তু দ্বিতীয়টার মুখে পাটকাঠিটা শিখাসহ জ্বলে ওঠে। এর থেকে কী বোঝা গেল?

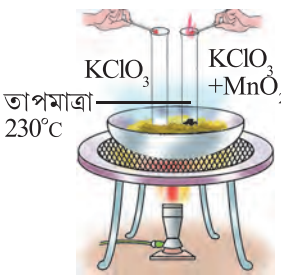

দ্বিতীয় টেস্টটিউবে অক্সিজেন উৎপন্ন হয়েছে। কিন্তু দুটো টেস্টটিউবকেই 650°C উষ্ণতায় গরম করে তাদের মুখে শিখাহীন জ্বলন্ত পাটকাঠি ধরলে দুটোই শিখাসহ জ্বলে উঠবে। এর থেকে বোঝা যায় যে বেশি উষ্ণতায় প্রথম টেস্টটিউবেও অক্সিজেন উৎপন্ন হয়েছে। দ্বিতীয় টেস্টটিউবে যে ম্যাঙ্গানিজ ডাইঅক্সাইড মেশানো হলো তার ফলে কী সুবিধা হলো?

তাহলে পরীক্ষাগারে সহজে অক্সিজেন তৈরি করতে গেলে আমাদের কী কী প্রয়োজন?

প্রয়োজনীয় রাসায়নিক দ্রব্য : পটাশিয়াম ক্লোরেট ($KClO_3$), অঙ্গারমুক্ত ম্যাঙ্গানিজ ডাইঅক্সাইড (MnO_2)।

ব্যবহৃত সরঞ্জাম : একটি হার্ড গ্লাস টেস্টটিউব, একটি সচ্ছিদ্র কর্ক, একটি নির্গমনল, একটি স্ট্যান্ড, একটি গ্যাসদ্রোণি, একটি ছবির মতো জলপূর্ণ পাত্র।

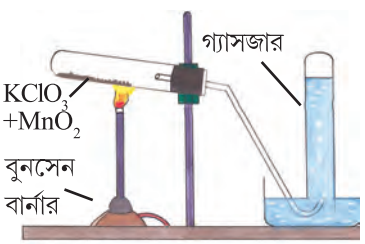

কী করা হয়	কী দেখা যায়	কী ধরনের সতর্কতা নেওয়া হয়
চারভাগ ওজনের $KClO_3$ সঙ্গে একভাগ ওজনের বিশুদ্ধ MnO_2 ভালো করে মিশিয়ে শক্ত কাচের টেস্টটিউবে নিয়ে ছবির মতো করে একটু ঝুঁকিয়ে আটকানো হয়। তারপর টেস্টটিউবের মুখে ছিদ্রযুক্ত কর্কের সাহায্যে নির্গমনল লাগিয়ে স্পিরিট ল্যাম্প বা বুনসেন বার্নারের সাহায্যে টেস্টটিউবটাকে সামনে রেখে পিছনের দিকে ধীরে ধীরে গরম করা হয়।	প্রথমে উৎপন্ন কিছুটা গ্যাস বেরিয়ে যেতে দিয়ে তারপর নির্গম নলটাকে জলভরতি গ্যাসজারের মুখে ঢোকালে জলের নিম্ন অপসারণ করে গ্যাসজারের মধ্যে একটা বর্ণহীন গ্যাস জমা হয়।	(i) $KClO_3$ ও MnO_2 ভালো করে মেশানো দরকার। (ii) MnO_2 -এর মধ্যে যেন চারকোল গুঁড়ো বা অ্যান্টিমনি সালফাইডের গুঁড়ো মিশে না থাকে। (iii) টেস্টটিউবটাকে যেন সামনের দিকে একটু ঝুঁকিয়ে রাখা হয় ও তাকে যেন সামনে থেকে পিছনের দিকে ধীরে ধীরে গরম করা হয়।

এইভাবে অক্সিজেন তৈরির সময় যে বিক্রিয়া হয় তার সমীকরণ হলো—

$2KClO_3 + [MnO_2] \longrightarrow 2KCl + 3O_2 + [MnO_2]$

হাইড্রোজেন

অক্সিজেনের মতো অন্য একটা পরিচিত গ্যাস হলো হাইড্রোজেন।

কী কী কাজে লাগে হাইড্রোজেন

রাসায়নিক শিল্পে হাইড্রোজেন একটা অতি প্রয়োজনীয় গ্যাস। কী কাজে লাগে হাইড্রোজেন?

হাইড্রোজেনের প্রধান ব্যবহার হলো অ্যামোনিয়া তৈরিতে। এই অ্যামোনিয়া থেকেই তৈরি করা হয় ইউরিয়া, অ্যামোনিয়াম সালফেট, অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট -এর মতো প্রয়োজনীয় সার আর বিভিন্ন শিল্পের প্রয়োজনীয় নাইট্রিক অ্যাসিড। এছাড়াও হাইড্রোজেন লাগে উদ্ভিজ্জ তেল থেকে বনস্পতিজাতীয় ভোজ্য ফ্যাট প্রস্তুতিতে।

রাসায়নিক শিল্পে স্টিম থেকে এবং প্রাকৃতিক গ্যাস থেকে হাইড্রোজেন তৈরি করা হয়।

হাইড্রোজেনের ভৌত ধর্ম

অক্সিজেনের মতোই আরও একটা পরিচিত গ্যাস হলো হাইড্রোজেন। যদিও পরিবেশে মুক্ত অবস্থায় এই গ্যাসের অস্তিত্ব প্রায় নেই বললেই চলে, কিন্তু একথা ভুললে চলবে কেন যে পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি জায়গা দখল করে আছে যে জলভাগ তা অক্সিজেন ও হাইড্রোজেন মিলিত হয়েই তৈরি। হাইড্রোজেন গ্যাস কীভাবে ভৌত ধর্মের সাহায্যে চেনা যায় তা দেখা যাক—

1. সাধারণ অবস্থায় হাইড্রোজেনও বর্ণহীন, গন্ধহীন, স্বাদহীন গ্যাস।
2. হাইড্রোজেন সবচেয়ে হালকা গ্যাস। এর চেয়ে বায়ু প্রায় 14.4 গুণ ভারী।

তাই হাইড্রোজেন গ্যাস ভরে একটা রবারের বেলুনের মুখ সুতো দিয়ে বেঁধে ঘরের মধ্যে যদি ছেড়ে দেওয়া যায়, দেখা যাবে যে বেলুনটা ওপরে উঠে ঘরের ছাদে ঠেকেছে।

হাইড্রোজেন গ্যাসে ভরতি বেলুন পাবে কীভাবে? তার জন্য নীচের হাতেকলমে পরীক্ষাটা করে দেখো।

হাতেকলমে

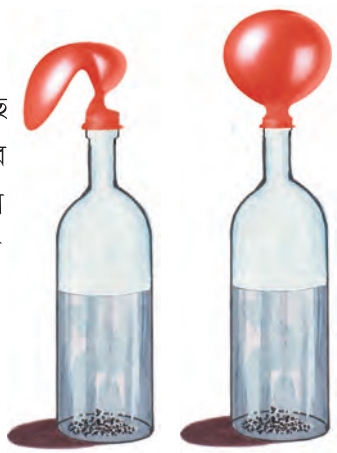

একটা সরুমুখ কাচের বোতলে কয়েকটা জিঙ্কের টুকরো নাও। হাতের কাছে একটা রবারের সাধারণ বেলুন আগে থেকেই টেনে বাড়িয়ে একটু নরম করে রাখো। এবার বোতলের মধ্যে কিছুটা সালফিউরিক অ্যাসিডের (না পেলে বাড়ির বাথরুম পরিষ্কার করার মিউরিয়েটিক অ্যাসিডের) পাতলা জলীয় দ্রবণ ঢেলে চট করে বোতলের মুখে বেলুনের খোলা মুখটা লাগিয়ে হাত দিয়ে চেপে ধরো। একটু পরে দেখবে বেলুনটা কিছুটা ফুলে উঠেছে। বেলুনের খোলা মুখ সুতো দিয়ে বেঁধে ঘরের মধ্যে ছেড়ে দাও। কী ঘটে লক্ষ করো।

জিঙ্কের টুকরো না পেলে দস্তার প্রলেপ দেওয়া বেশ কয়েকটা লোহার সাধারণ পেরেক নিয়েও পরীক্ষাটা করতে পারো; এখানে জিঙ্কের সঙ্গে অ্যাসিডের বিক্রিয়ায় যে হাইড্রোজেন গ্যাস উৎপন্ন হয় সেটাই বেলুনের মধ্যে ভরতি হয়।

3. হাইড্রোজেন জলে প্রায় অদ্রাব্য।

4. হাইড্রোজেন নিজে জ্বলে, কিন্তু অন্যকে জ্বলতে সাহায্যে করে না।

একটা টেস্টটিউবে কিছুটা জিঙ্কের গুঁড়ো নিয়ে তার মধ্যে কিছুটা সালফিউরিক অ্যাসিডের পাতলা জলীয় দ্রবণ দাও। দ্রবণের ভিতর দিয়ে বুদবুদের মতো একটা গ্যাস বেরিয়ে আসতে দেখবে। যদি টেস্টটিউবের মুখে সাবধানে একটা জ্বলন্ত দেশলাই কাঠি ধরো তবে দেখতে পাবে যে ওই বেরিয়ে আসা গ্যাসটা টেস্টটিউবের মুখে শব্দসহ দপ করে নীল শিখায় জ্বলে ওঠে এবং দেশলাই কাঠিটা নিভে যায়। এই পরীক্ষা করার সময় অবশ্যই শিক্ষক/শিক্ষিকার সাহায্য নাও।

5. হাইড্রোজেনের তিনটে আইসোটোপ হলো ${}_1^1H$, ${}_1^2H$ এবং ${}_1^3H$, যদিও প্রকৃতিতে শেষ দুটোর পরিমাণ খুবই কম।

হাইড্রোজেনের রাসায়নিক ধর্ম

1. হাইড্রোজেন অণু দ্বিপরমাণুক। দুটি টাংস্টেন তড়িৎ দ্বারের সাহায্যে বিদ্যুৎস্ফুলিঙ্গ (2000°C) সৃষ্টি করে প্রায় শূন্য চাপে H_2 গ্যাস চালনা করলে H_2 অণু ভেঙে দুটি হাইড্রোজেন পরমাণুতে পরিণত হয়। একে পারমাণবিক বা সক্রিয় হাইড্রোজেন বলে। এই পারমাণবিক হাইড্রোজেন খুবই শক্তিশালী বিজারক।

2. দহনশীলতা ঃ হাইড্রোজেন গ্যাস দহনে সাহায্য করে না, কিন্তু নিজে দাহ্য। অক্সিজেনের সঙ্গে হাইড্রোজেন মিশিয়ে আগুন ধরিয়ে দিলে বিস্ফোরণসহ জ্বলে ওঠে ও স্টিম উৎপন্ন করে।

$$2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$$

3. অধাতুর সঙ্গে বিক্রিয়া ঃ অধাতুর সঙ্গে হাইড্রোজেন বিক্রিয়া করে সেই অধাতুর হাইড্রাইড যৌগ উৎপন্ন করে।

(a) সাধারণ উষ্ণতায় অন্ধকারে ও জলীয় বাষ্পের অনুপস্থিতিতে ক্লোরিনের সঙ্গে হাইড্রোজেনের বিক্রিয়া হয় না। কিন্তু বিক্ষিপ্ত সূর্যালোকের উপস্থিতিতে হাইড্রোজেন ও ক্লোরিন বিস্ফোরণসহ বিক্রিয়া করে হাইড্রোজেন ক্লোরাইড গ্যাস উৎপন্ন করে।

$$H_2 + Cl_2 \rightarrow 2HCl$$

(b) উচ্চচাপে (প্রায় 200 বায়ুমণ্ডলীয় চাপে) এবং উষ্ণতায় (550°C) লোহাচুর অনুঘটকের উপস্থিতিতে হাইড্রোজেন ও নাইট্রোজেন যুক্ত হয়ে ঝাঁঝালো গন্ধযুক্ত অ্যামোনিয়া (NH_3) গ্যাস উৎপন্ন করে।

$$N_2 + 3H_2 \rightarrow 2NH_3$$

(c) হলুদ রং-এর সালফারকে তাপ দিয়ে গলিয়ে তার ওপর দিয়ে হাইড্রোজেন গ্যাস চালনা করলে পচা ডিমের দুর্গন্ধযুক্ত হাইড্রোজেন সালফাইড (H_2S) গ্যাস উৎপন্ন হয়।

$$H_2 + S \rightarrow H_2S$$

4. ধাতুর সঙ্গে বিক্রিয়া : উত্তপ্ত লিথিয়াম, সোডিয়াম, পটাশিয়াম ও ক্যালশিয়ামের ওপর দিয়ে হাইড্রোজেন গ্যাস চালনা করলে ধাতব হাইড্রাইড উৎপন্ন হয়।

$$2Na + H_2 \rightarrow 2NaH \text{ (সোডিয়াম হাইড্রাইড)}$$

$$Ca + H_2 \rightarrow CaH_2 \text{ (ক্যালশিয়াম হাইড্রাইড বা হাইড্রোলিথ)}$$

5. বিজারণ ক্রিয়া : অক্সিজেনের প্রতি হাইড্রোজেনের বিশেষ আসক্তি দেখা যায়। অক্সিজেনের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার প্রবণতা খুব বেশি হওয়ায় হাইড্রোজেন বিজারকরূপে কাজ করে। উত্তপ্ত কালো কিউপ্রিক অক্সাইডের ওপর দিয়ে হাইড্রোজেন গ্যাস চালনা করলে, কিউপ্রিক অক্সাইড বিজারিত হয়ে লালচে-বাদামি রং-এর কপার উৎপন্ন হয়। হাইড্রোজেন নিজে জারিত হয়ে জলে পরিণত হয়।

$$CuO + H_2 \rightarrow Cu + H_2O$$

6. অন্তর্ধূতি : কতকগুলো ধাতু বিশেষত প্যালাডিয়াম, প্লাটিনাম, আয়রন, কোবাল্ট, নিকেল প্রভৃতি সাধারণ উষ্ণতায় হাইড্রোজেন গ্যাসকে অধিশোষণ করতে পারে। আবার উত্তপ্ত করলে এই শোষিত হাইড্রোজেন বেরিয়ে আসে। এই ঘটনাকে অন্তর্ধূতি বলে এবং ধাতবপৃষ্ঠে শোষিত হাইড্রোজেনকে অন্তর্ধূত হাইড্রোজেন বলে। পরীক্ষায় দেখা যায় সাধারণ হাইড্রোজেন অপেক্ষা অন্তর্ধূত হাইড্রোজেন রাসায়নিকভাবে বেশি সক্রিয়।

হাইড্রোজেন (H_2) গ্যাস প্রস্তুতি

পূর্বপাঠের ভিত্তিকে কাজে লাগিয়ে নীচের সমীকরণের শূন্যস্থান পূরণ করো, প্রয়োজনে শিক্ষক/শিক্ষিকার সাহায্য নাও। প্রয়োজনে বিক্রিয়ার সমীকরণগুলোর সমতাবিধান করো।

A. 1. $Zn + H_2SO_4$ (লঘু) $\rightarrow ZnSO_4 + H_2$

2. $Mg + HCl$ (লঘু) $\rightarrow MgCl_2 +$ _____

3. $Fe + H_2SO_4$ (লঘু) $\rightarrow FeSO_4 + H_2$

4. $Al +$ HCl (লঘু) $\rightarrow AlCl_3 +$ _____

ওপরের সমীকরণ থেকে বিকারক থেকে বিক্রিয়াজাত পদার্থ উৎপাদন সম্বন্ধে সাধারণ যে বিষয়টি জানলে তা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে লেখো .....

B. 1. $Na + H_2O$ (ঠান্ডা জল) $\rightarrow NaOH + H_2$

2. $Ca + H_2O$ (ঠান্ডা জল) $\rightarrow Ca(OH)_2 +$ _____

3. $Mg + H_2O$ (ফুটন্ত জল) $\rightarrow Mg(OH)_2 +$ _____

4. $Al + H_2O$ (ফুটন্ত জল) $\rightarrow Al(OH)_3 +$ _____

5. লোহিততপ্ত $Fe + H_2O$ (স্টিম) $\rightarrow Fe_3O_4 +$ _____

ওপরের সমীকরণগুলো থেকে তোমার সিদ্ধান্তগুলো নীচের ফাঁকা জায়গায় লেখো .....
.....

C. 1. $Zn + 2NaOH$ (গাঢ় দ্রবণ) $\rightarrow Na_2ZnO_2 + H_2$

2. $2Al + 2NaOH$ (গাঢ় দ্রবণ) $+ 2H_2O \rightarrow 2NaAlO_2 + 3H_2$

উপরের সমীকরণগুলো থেকে তোমার বিক্রিয়ার ধরন সম্বন্ধে যা মনে হয় তা লেখো.....
.....

এটাও তোমরা জেনে রেখো —

অধাতু সিলিকনের সঙ্গেও তীব্র ক্ষার (NaOH বা KOH) দ্রবণের বিক্রিয়ায় হাইড্রোজেন উৎপন্ন হয়।

$Si + 2NaOH + H_2O = Na_2SiO_3 + 2H_2$

D. সালফিউরিক অ্যাসিডযুক্ত জল (H_2O) $\xrightarrow{\text{তড়িৎ বিশ্লেষণ}}$ O_2 + _____

জল ভালো তড়িৎ পরিবহণ করতে পারে না। জলের মধ্যে লঘু বেরিয়াম হাইড্রক্সাইড দ্রবণ মিশিয়ে তড়িৎ বিশ্লেষণ করলে বিশুদ্ধ হাইড্রোজেন পাওয়া যায়।

E. $CaH_2 + 2H_2O \rightarrow Ca(OH)_2 +$ _____

$LiH + H_2O \rightarrow LiOH +$ _____

CaH_2 বা LiH -কে ধাতব হাইড্রাইড বলে।

উপরের বিক্রিয়ার সমীকরণগুলো থেকে বিক্রিয়াজাত পদার্থ সম্বন্ধে তোমার যা মনে হয় তা লেখো.....
.....

তাহলে তোমরা দেখলে নানাভাবে আমরা হাইড্রোজেন গ্যাস তৈরি করতে পারি। এবার আমরা হাতেকলমে পরীক্ষাগারে কীভাবে হাইড্রোজেন গ্যাস প্রস্তুত করা হয় তা করে দেখি।

পরীক্ষাগারে হাইড্রোজেন গ্যাস প্রস্তুতি

প্রয়োজনীয় রাসায়নিক দ্রব্য :

1. অবিশুদ্ধ জিঙ্কের ছিবড়া 2. লঘু সালফিউরিক অ্যাসিড 3. পাতিত জল

প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম :

1. একটি উলফ বোতল 2. দীর্ঘনল ফানেল 3. উলফ বোতলের মুখের সচ্ছিদ্র কর্ক 4. নির্গমনল 5.কিছুটা রবারের নল 6. ভেসলিন

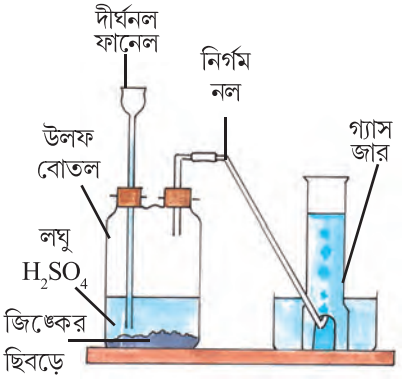

কী করলে	কী দেখলে	কী বুঝতে পারলে
চিত্রের মতো একটি উলফ বোতলে কিছুটা জিঙ্কের ছিবড়ে নাও। বোতলের একমুখে কর্কের মধ্য দিয়ে একটি দীর্ঘনল ফানেল এবং অপর মুখের মধ্যে দিয়ে একটি নির্গমনল লাগাও। দীর্ঘনল ফানেলের সাহায্যে উলফ বোতলের মধ্যে কিছুটা জল এমনভাবে ঢালো যেন দীর্ঘনলের শেষপ্রান্তটি জলের মধ্যে নিমজ্জিত থাকে। এবার নির্গমনলের অপর প্রান্তে ফুঁ দাও। (i) কী দেখবে? (ii) এবার নির্গমনলের মুখ বুড়ো আঙুল দিয়ে চেপে ধরো এবং দীর্ঘনলে জলতল লক্ষ করো। যদি পাত্রটি বায়ুনিরুদ্ধ হয় তবে দীর্ঘনল ফানেলের সাহায্যে কিছুটা লঘু সালফিউরিক অ্যাসিড বোতলে ঢেলে দাও। (iii) অ্যাসিড জিঙ্কের সংস্পর্শে আসামাত্র তুমি কী দেখবে? (iv) কিছুটা গ্যাস বেরিয়ে যাবার পর নির্গম-নলটির শেষপ্রান্ত জলপূর্ণ গ্যাসদ্রোণির মধ্যে ডোবাও। এবার একটা জলপূর্ণ গ্যাসজার গ্যাসদ্রোণির উপর ছবির মতো করে বসাও ও কী ঘটে তা লক্ষ করো। (v) ওই গ্যাসজারের মধ্যে জমা গ্যাসে জ্বলন্ত পাটকাঠি ধরলে তুমি কী দেখতে পাবে?	(i) দীর্ঘনল ফানেলের মধ্যে কিছুটা জল উঠল। (ii) যদি দেখো দীর্ঘনল ফানেলের জলতল আর নামছে না তার থেকে তুমি কী সিদ্ধান্ত নিতে পারো? তুমি কি বলতে পারো যে পাত্রটি বায়ুনিরুদ্ধ হয়েছে? .... (iii) .... (iv) .... (v) এই গ্যাসটি জ্বালালে সশব্দে নীলাভ শিখায় জ্বলে।	(i) .... (ii) .... (iii) .... রাসায়নিক বিক্রিয়া লেখো এবং গ্যাসটিকে শনাক্ত করো। ..... (iv) .... (v) এই গ্যাসটি আগুনের সংস্পর্শে নিজে জ্বলে এবং গ্যাসটি বাতাসের থেকে হালকা। এই গ্যাস প্রস্তুতিতে তুমি কী কী সতর্কতা অবলম্বন করবে? .....

4 প্রকৃতিতে ও জীবজগতে বিভিন্নরূপে কার্বন যৌগের অবস্থান

বাতাসে কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ ক্রমশ বেড়ে যাওয়ার খবর তোমরা রোজই শুনছ। তোমরা শুনছ দূষণ কমাতে গাছ লাগানোর কথা। তাহলে গাছ লাগালে বাতাসে কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ কমে কী করে? তাহলে তো জানতে হয় প্রকৃতিতে কার্বনঘটিত যৌগগুলো কীভাবে তৈরি হয় আর কীভাবেই বা অন্য যৌগে বদলে যায়।

প্রকৃতিতে কার্বনঘটিত যৌগের অবস্থান

কার্বন পরমাণুর বিশেষ কিছু ধর্মের (1. কার্বনের চতুর্যোজ্যতা ; 2. C, O, N, S এর সঙ্গে এক বা একাধিক বন্ধন গঠনের ক্ষমতা) জন্য জীবদেহের সমস্ত জৈব অণু তৈরিতে কার্বন অপরিহার্য। কার্বন নানারূপে প্রকৃতির সর্বত্র ছড়িয়ে আছে —

1) মুক্ত অবস্থায় কার্বন— হিরে, কোক, গ্যাসকার্বন, গ্রাফাইট ইত্যাদি।

2) বিভিন্ন মৌলের সঙ্গে যুক্ত অবস্থায়— জীবদেহ গঠনকারী মৌলদের মধ্যে অপরিহার্য হলো কার্বন। উদ্ভিদ ও প্রাণীর দেহে কার্বন বিভিন্ন জৈব পলিমার যৌগ (প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট, DNA, RNA, সেলুলোজ ইত্যাদি) ও নানা ক্ষুদ্র অণু (লিপিড, ATP ইত্যাদি) রূপে অবস্থান করে। প্রাণীদেহের হরমোন, সমস্ত রকমের প্রোটিন ইত্যাদির অণুর মধ্যেও কার্বন পরমাণু উপস্থিত। মানবদেহের মোট ভরের প্রায় 50 ভাগই কার্বনের ভর। শামুক, ঝিনুক ও অন্যান্য জলজ ক্ষুদ্রজীবের খোলায় আছে ক্যালশিয়াম কার্বনেট। পেট্রোলিয়াম, প্রাকৃতিক গ্যাসের হাইড্রোকার্বন যৌগদেরও উপাদান কার্বন ও হাইড্রোজেন। শর্করা ও লিপিডের মধ্যে কার্বন প্রধানত হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের সঙ্গে যুক্ত থাকে। প্রোটিনের মধ্যে কার্বন হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেনের সঙ্গে যুক্ত অবস্থায় থাকে। প্রকৃতির মধ্যে বিভিন্ন আকরিকের [চুনাপাথর ($CaCO_3$), মার্বেল($CaCO_3$),ডলোমাইট($CaCO_3$,$MgCO_3$), ম্যাগনেসাইট ($MgCO_3$), ক্যালামাইন ($ZnCO_3$)] মধ্যেও কার্বন রয়েছে। কার্বন ডাইঅক্সাইড, কার্বন মনোক্সাইড গ্যাসও কার্বন যৌগ। প্রাকৃতিক গ্যাসে উপস্থিত মিথেনের অণুতে কার্বন পরমাণু হাইড্রোজেন পরমাণুর সঙ্গে যুক্ত অবস্থায় থাকে।

ডিএনএ অণুর মডেল

চুনাপাথর

রেশম, পশম বা পাট এগুলোও কার্বনঘটিত যৌগ। এথেকে আমাদের পোশাক তৈরি হয়। বর্তমান যুগে বিভিন্ন আসবাবপত্র, ইলেকট্রনিক দ্রব্য, তৈরিতেও কার্বনের পলিমার ব্যবহৃত হয়। নানারকম জীবনদায়ী ওষুধও কার্বনের যৌগ। বিভিন্ন অ্যালকোহল, ক্লোরোফর্ম, বেঞ্জিন, টলুইন ইত্যাদি বিভিন্ন জৈব দ্রাবকও কার্বনেরই যৌগ।

টুকরো কথা

পৃথিবীর সর্বত্র (বায়ুমণ্ডলে, ভূপৃষ্ঠে, সমুদ্রগর্ভে, পৃথিবীর অভ্যন্তরে, বিভিন্ন খনিজ আকরিকে, এমন কী প্রাণী, উদ্ভিদ ও জীবাণুরাজ্যেও কার্বন বিভিন্নরূপে ছড়িয়ে আছে। খালিচোখে দেখে আমরা বুঝতে পারি না যে সারা পৃথিবী জুড়েই কীভাবে কার্বন যৌগদের পরিবর্তন হয়ে চলেছে। কখনও পরিবেশ থেকে জীবদেহে আবার কখনও জীবদেহ থেকে পরিবেশে কার্বনের স্থানান্তর ঘটে। পরিবেশ ও জীবদেহের মধ্যে কার্বনের এই চক্রাকার আবর্তনই হলো কার্বন চক্র।

কার্বন চক্রের ধাপসমূহ

(1) পরিবেশ থেকে CO_2 — রূপে কার্বনের অপসারণ

(a) বাতাসের কার্বন ডাইঅক্সাইড আবদ্ধীকরণ

সবুজ গাছ, জলের শ্যাওলা ও সায়ানোব্যাকটেরিয়া সালোকসংশ্লেষের মাধ্যমে বাতাসের কার্বন ডাই-অক্সাইডকে সরল খাদ্যে (গ্লুকোজ) পরিণত করে। পরে গ্লুকোজের পরিবর্তনে তৈরি হয় স্টার্চ ও অন্যান্য বহু জৈব যৌগ। বিভিন্ন জৈব যৌগ সংশ্লেষণকে একত্রে বলা হয় জৈব সংশ্লেষণ (Biosynthesis)। এর ফলে বাতাসের কার্বন ডাইঅক্সাইড যৌগে আবদ্ধ হয় ও কোশের নানা স্থায়ী যৌগে পরিণত হয়। এই ধাপকে আমরা তাই বলব কার্বন আত্তীকরণ (Carbon assimilation)। কিছু অবায়ুজীবী ব্যাকটেরিয়া কার্বন মনোক্সাইডকে (CO) জৈব যৌগে রূপান্তরিত করতে পারে।

(b) সামুদ্রিক প্রাণীর খোলক গঠন

শামুক, ঝিনুক, ও কোরালজাতীয় প্রাণীরা জলে দ্রবীভূত কার্বন ডাইঅক্সাইড শোষণ করে তাকে কার্বনেট যৌগে রূপান্তরিত করে ও তাকে খোলক গঠনের কাজে ব্যবহার করে।

(c) ধাতব কার্বনেট গঠন

স্ট্যালাকটাইট ও স্ট্যালাগমাইট

পরিবেশে বিভিন্ন ধাতব কার্বনেট খনিজ রূপে পাওয়া যায়। যেমন— মার্বেল, চুনাপাথর ও ডলোমাইট ইত্যাদি। বায়ুমণ্ডলের CO_2 শোষণ করে বিভিন্ন ধাতব কার্বনেট ($CaCO_3$,$MgCO_3$) গঠন করে। উদাহরণরূপে চুনাপাথরের গুহায় স্ট্যালাকটাইটের ও স্ট্যালাগমাইটের সুন্দর সুন্দর নানা আকৃতির কথা বলা যায়। এগুলো $CaCO_3$ দিয়ে তৈরি হয়।

(d) বৃষ্টির সময় কার্বনেট গঠন

বৃষ্টির সময় CO_2 জলের সঙ্গে বিক্রিয়ায় কার্বনিক অ্যাসিড (H_2CO_3) গঠন করে। কার্বনিক অ্যাসিড ভেঙে গিয়ে বাইকার্বনেট আয়ন (HCO_3^-) উৎপন্ন হয়। কার্বন ডাইঅক্সাইড সমুদ্রের জলে ক্যালশিয়ামের উপস্থিতিতে ক্যালশিয়াম কার্বনেট ($CaCO_3$) গঠন করে। এটি পরে অধঃক্ষিপ্ত হয়।

(2) পরিবেশে CO_2, CO, CH_4 — রূপে কার্বনের সংযোজন

(a) জীবের শ্বসন ও খাদ্যের জারণে কার্বন ডাইঅক্সাইড উৎপাদন

সবুজ উদ্ভিদ শ্বাসকার্যের সময় দেহে গ্লুকোজের জারণে তৈরি কার্বন ডাইঅক্সাইড ছেড়ে দেয়। এটা সালোকসংশ্লেষের বিপরীত প্রক্রিয়া যেখানে CO_2 আবার পরিবেশে ফিরে যায়। সমস্ত তৃণভোজী জীব উদ্ভিদদেহ থেকে প্রাপ্ত খাদ্যের ভাঙনে তৈরি CO_2 বাতাসে ফিরিয়ে দেয়। অন্যান্য পরভোজী জীবরা তৃণভোজী জীবদের দেহজ খাদ্য থেকে পুষ্টিলাভ করে। এর পাশাপাশি শ্বাসকার্যের মাধ্যমে তারাও বাতাসে CO_2 ফিরিয়ে দেয়।

(b) মৃত জীবদেহ থেকে ব্যাকটেরিয়া ও ছত্রাকের মাধ্যমে জৈববস্তু পচন ও অন্যান্য পরিবর্তন

তোমরা সকলেই ভিজে কাঠ বা পাঁউরুটিতে ছাতা ধরতে দেখেছ। তোমরা জানো গরমকালে দুপুরে রান্না করা ডাল বা ভাতও জীবাণুর ক্রিয়ায় নষ্ট হয়ে যায়। মৃত জীবদেহের বা উদ্ভিজ্জ বা প্রাণীজ জটিল অণুদের পরিবর্তন না ঘটলে পৃথিবী নানান বর্জ্যে ভরে উঠত। বিভিন্ন ব্যাকটেরিয়া ও ছত্রাক বিভিন্ন এনজাইমের সাহায্যে এইসব জটিল যৌগদের নানান পরিবর্তন ঘটায় ও সরলতর যৌগ তৈরি করে। এই সময় কিছু কার্বনঘটিত যৌগ মাটি ও জলে মেশে। কিছু কার্বন ডাইঅক্সাইড বাতাসে ফিরেও যায়।

পৃথিবীর বিস্তৃত জলাভূমি - ধানখেত - বনভূমির মিথেন (CH_4) উৎপাদনকারী ব্যাকটেরিয়া নানান উদ্ভিজ্জ পদার্থের বিয়োজনে মিথেন তৈরি করে বাতাসে ছেড়ে দেয়। গবাদিপশুদের পাকস্থলীতে যেসব ব্যাকটেরিয়া উদ্ভিদের সেলুলোজ হজমে সাহায্য করে, তারাও মিথেন তৈরি করে। উইপোকাদের অন্ত্রে বসবাসকারী জীবাণুরাও মিথেন তৈরি করে বাতাসে ছেড়ে দেয়। এইভাবে বায়ুমণ্ডলে মিশে যাওয়া মিথেন বায়ুমণ্ডলের উষ্ণতা বৃদ্ধি করে। তাই মিথেন হলো অন্যতম গ্রিনহাউস গ্যাস।

(c) মানুষের জ্বালানি দহন, সিমেন্ট তৈরি, দাবানল ও অগ্ন্যুৎপাত

শক্তির প্রয়োজনে আমরা রোজই পুড়িয়ে চলেছি তেল-কয়লা-গ্যাস-কাঠ। এইসব জ্বালানির দহনে প্রত্যেক দিনই হাজার হাজার টন CO আর CO_2 বাতাসে মিশে যাচ্ছে। সিমেন্ট তৈরির জন্য প্রচুর চুন (CaO) লাগে। পোড়াচুন তৈরির সময় চুনাপাথরকে গরম করা হয়, আর রাসায়নিক বিক্রিয়া ($CaCO_3 \rightarrow CaO + CO_2$) ঘটার সময় উৎপন্ন CO_2 বাতাসে মিশে যায়। প্রাকৃতিক নানান ঘটনা — দাবানল ও অগ্ন্যুৎপাতের মধ্যে দিয়েও বাতাসে কার্বন ডাইঅক্সাইড ও কার্বন মনোক্সাইড মিশে যায়।

(d) সমুদ্রে শোষিত CO_2-এর মুক্তি

বিজ্ঞানীরা হিসেব করে দেখেছেন যে মানুষের নানা কাজকর্মের ফলে সৃষ্ট কার্বন ডাইঅক্সাইডের বিরাট অংশ (48%) শুষে নেয় সমুদ্রের জল। এর ফলে বাতাসে কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ ততটা বাড়তে পারে না। পরিবেশের তাপমাত্রা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে CO_2- শোষণকারী অ্যালগির (শৈবাল) CO_2 শোষণ ও ব্যবহার ক্ষমতা আগামী দিনে কমে যেতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। ফলে পরিবেশে কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ আরও বেড়ে যেতে পারে।

(e) সামুদ্রিক প্রাণীর খোলকের দহন

শামুক, ঝিনুকের মৃত্যুর পর মানুষ তার প্রয়োজনে ওই খোলকগুলোকে পোড়ায়। ফলে বাতাসে প্রচুর পরিমাণে কার্বন ডাইঅক্সাইড মিশে যায়।

বহুরূপতা

নীচে তোমাদের নুন, তুঁতে আর ফটকিরির দানা কেমন দেখতে হয় তা দেখানো হলো।

নুন

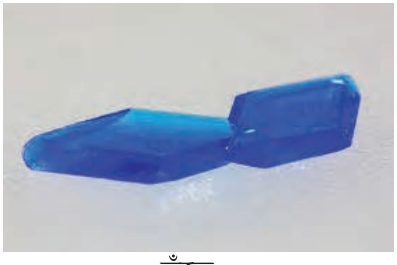

তুঁতে

ফটকিরি

সহজেই চোখে পড়বে যে এই দানাগুলোর জ্যামিতিক আকৃতি সুষম এবং সুন্দর। এই সুষম জ্যামিতিক আকৃতিবিশিষ্ট কঠিন দানাকে বলে কেলাস বা ক্রিস্টাল (Crystal)। শুধু যৌগদেরই যে ক্রিস্টাল হয় তা নয়, মৌলদেরও ক্রিস্টাল হতে পারে। যেমন সালফারের দু -রকম ক্রিস্টাল পাওয়া যায় : নীচের ছবি দুটো দেখো।

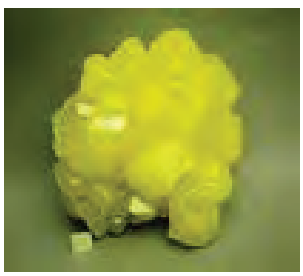

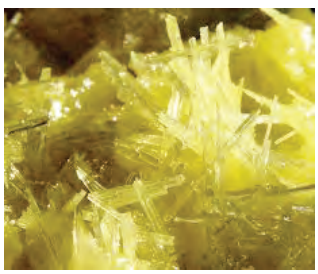

পরীক্ষা করো : একটুখানি গুঁড়ো সালফার জোগাড় করে কাচের টেস্টটিউবে নিয়ে সাবধানে গরম করো। গলে গেলে হালকা হলুদ রঙের তরল পাওয়া যাবে। তরলটা নিয়ে ফিল্টার কাগজে ঢেলে দাও। তরল জমে শুষ্ক হতে শুরু হলে ফিলটার কাগজটা খুলে নাও। হলুদ রঙের ছুঁচালো ক্রিস্টাল দেখতে পাবে। গরম করার আগে যে গুঁড়ো সালফার ছিল তাতে এমন ছুঁচালো ক্রিস্টাল ছিল না। এখন যে সালফার পাওয়া গেল তার ক্রিস্টালের গঠন আলাদা। এই দুটো হলো সালফারের দু-রকম রূপ। এদের বলা হয় সালফারের রূপভেদ

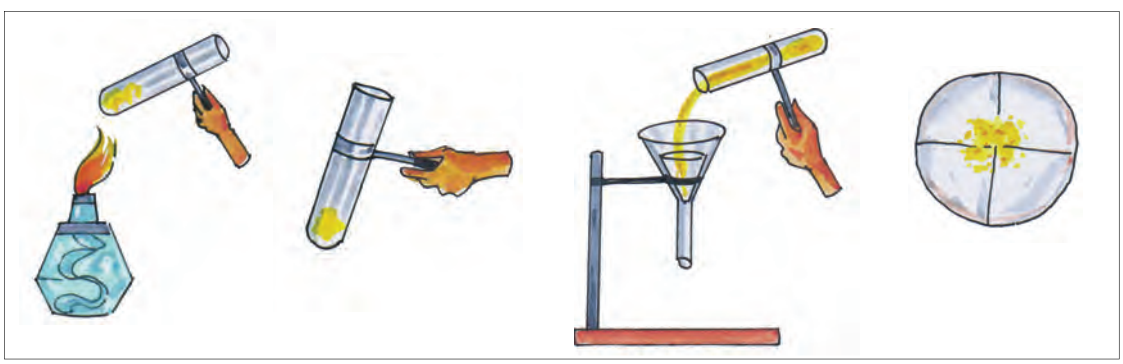

বা বহুরূপ (Allotrope)। যখন কোনো মৌলকে একাধিক ভৌতরূপে পাওয়া যায় তখন সেই ভৌতরূপগুলোকে মৌলটির বহুরূপ বলা হয়। সালফার ছাড়া কার্বন, ফসফরাস, বোরনের একাধিক বহুরূপ আছে। এছাড়াও গ্যাসীয় মৌল অক্সিজেনেরও বহুরূপতা দেখা যায়।

কার্বনের বহুরূপতা

কাঠকয়লা বা চারকোল

হিরে

গ্রাফাইট

ওপরে তোমাদের যেসব জিনিসের ছবি দেখানো হয়েছে তাদের একটা মিল আছে। এগুলো আলাদা রকমের দেখতে হলেও এরা সবাই কার্বন দিয়ে তৈরি। এগুলো হলো কার্বনের রূপভেদ।

মৌলের বহুরূপদের আণবিক গঠনে বা ক্রিস্টালের মধ্যে অণুদের পারস্পরিক অবস্থানে পার্থক্য থাকে। তাই মৌলের বহুরূপদের বিভিন্ন ভৌত ধর্মে (ঘনত্ব, রং, বিশেষ দ্রাবকে দ্রাব্যতা) পার্থক্য দেখা যায়। অনেক সময় বহুরূপগুলোকে বাইরে থেকে দেখতেও আলাদা হয়। কখনো কখনো একই মৌলের বহুরূপদের রাসায়নিক ধর্মেও বেশ কিছুটা পার্থক্য দেখা যায় (লাল ও সাদা ফসফরাস, অক্সিজেন ও ওজোন)।

তাপমাত্রা ও চাপ পরিবর্তন করে অনেকসময় একটা বহুরূপ থেকে অন্য বহুরূপে পরিবর্তন (আন্তঃপরিবর্তন) ঘটানো যায়। ওপরে তোমরা সালফার নিয়ে এই পরীক্ষাই করেছ। তবে সবসময় এই আন্তঃপরিবর্তন ঘটানো সহজ নাও হতে পারে। কার্বনের বহুরূপগুলোর আন্তঃপরিবর্তন সহজসাধ্য নয়।

কার্বনের রূপভেদগুলোকে সাধারণত দু-ভাগে ভাগ করা হয় ; (1) নিয়তাকার (Crystalline) ও (2) অনিয়তাকার (Amorphous)। নিয়তাকার ও অনিয়তাকার এই শ্রেণিবিভাগ পদার্থগুলোর বাইরে থেকে দেখে যা মনে হয় তার ভিত্তিতে করা হয়। বর্তমানে উন্নত পরীক্ষায় জানা গেছে যে কার্বনের অনিয়তাকার রূপভেদগুলো প্রকৃতপক্ষে গ্রাফাইটেরই অতি ক্ষুদ্র ক্রিস্টালের সমষ্টি। কার্বনের নিয়তাকার রূপভেদগুলোর মধ্যে অণুর গঠনে অনেক পার্থক্য থাকে বলে নানান ভৌতধর্মে অনেকটা পার্থক্য দেখা যায়।

গ্রাফাইট ও হিরের গঠন ও ভৌতধর্মের তুলনা

গ্রাফাইট তোমরা দেখেছ, তার গুঁড়ো নিয়ে খেলাও করেছ নিশ্চয়ই। কোথায়? — কোনো পেনসিলের শিস ছুঁচালো করার সময় যে ধুলোর মতো গুঁড়োটা বেরোয় সেটাই তো গ্রাফাইটমিশ্রিত গুঁড়ো। পেনসিলের শিসের গুঁড়োটা নিয়ে আঙুল ঘষে দেখলে দেখা যায় কী সহজেই না আঙুলে পিছলে গেল। পাশের ছবিতে ↘ বোঝাচ্ছে আঙুল দিয়ে গুঁড়োর ওপর বল প্রযুক্ত হলো। → বোঝাচ্ছে গ্রাফাইটের গুঁড়োগুলোর ওপর আঙুল যেদিকে পিছলে গেল।

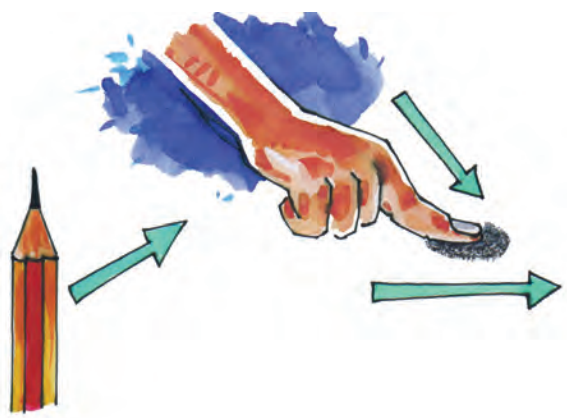

কেন এমন হয়? তাহলে তো জানতে হয় গ্রাফাইটের আণবিক গঠন কী রকম। বিজ্ঞানীরা পরীক্ষায় হিরে

আর গ্রাফাইটের গঠন সম্বন্ধে যা জেনেছেন নীচে ছবিতে দেখানো হলো। ছবিতে ● C পরমাণু বোঝাচ্ছে।

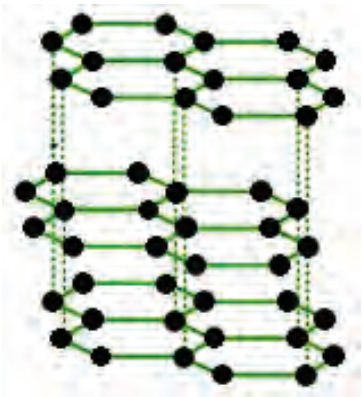

গ্রাফাইটের আংশিক গঠন

হিরের আংশিক গঠন

ছবি থেকে দেখা যাচ্ছে যে গ্রাফাইটের নমুনায় কার্বন পরমাণুরা বিভিন্ন সমান্তরাল স্তরে সাজানো থাকে। পরীক্ষায় আরো একটা জিনিস বোঝা যায় — স্তরগুলোর মধ্যে দূরত্ব বেশি এবং আকর্ষণ বল বেশ দুর্বল। এর ফলে ওপরের স্তরে বল প্রযুক্ত হলে সে নীচের স্তরের ওপর দিয়ে পিছলে সরে যেতে পারে। এই কারণেই পেনসিলের শিসের গুঁড়োর ওপর দিয়ে তোমার আঙুল সহজে পিছলে গিয়েছিল। হিরের অণুর গঠনে দেখা যাচ্ছে যে সেখানে কার্বন পরমাণুরা মোটেই এমন স্তরবিভক্ত থাকে না। সেখানের ত্রিমাত্রিক জালের মতো গঠনে গ্রাফাইটের মতো ফাঁকফোকর নেই, কার্বন পরমাণুরাও পরস্পর দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ। এই কারণে হিরে (1) গ্রাফাইটের চেয়ে অনেক শক্ত এবং (2) হিরের ঘনত্ব গ্রাফাইটের ঘনত্বের চেয়ে বেশি।

- তেলের খনি খোঁড়ার যন্ত্রের যে মুখটা পাথর কেটে নীচে নামে সেখানে কী ব্যবহার করা উচিত — হিরে না গ্রাফাইট?

- কোনো যন্ত্রের পিচ্ছিলকারক হিসেবে কোনটি ব্যবহৃত হতে পারে — তেল আর হিরের গুঁড়োর মিশ্রণ না, তেল আর গ্রাফাইটের গুঁড়োর মিশ্রণ?

তাপ পরিবাহিতা

ঘরের উষ্ণতায় গ্রাফাইট ও হিরে দুটোই তাপের সুপরিবাহী। ঘরের উষ্ণতায় (25^0C) হিরের তাপ পরিবাহিতা যে কোনো ধাতুর চেয়ে বেশি। এই কারণে এখন কৃত্রিম হিরের সূক্ষ্ম পাতের ওপর ইলেকট্রনিক বর্তনী (Circuit) তৈরি করা হয়। বর্তনীতে উৎপন্ন তাপ হিরের পাতের মধ্যে দিয়ে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। এর ফলে বর্তনী ঠান্ডা থাকে এবং ভালোভাবে কাজ করতে পারে।

তড়িৎ পরিবাহিতা

গ্রাফাইট তড়িতের সুপরিবাহী তাই গ্রাফাইট দিয়ে তড়িৎ বিশ্লেষণের তড়িৎ দ্বার তৈরি করা হয়। হিরে কার্যত তড়িতের কুপরিবাহী।

রাসায়নিক সক্রিয়তা

যথেষ্ট অক্সিজেনের মধ্যে পোড়ালে হিরে আর গ্রাফাইট দুটোই দেয় কার্বন ডাইঅক্সাইড। কিন্তু সাধারণভাবে দেখলে গ্রাফাইটের চেয়ে হিরের রাসায়নিক সক্রিয়তা অনেক কম।

ফুলারিন

কার্বনের আর একটি রূপভেদ ফুলারিন প্রথমে গবেষণাগারে ও পরে প্রকৃতিতে পাওয়া গেছে। ফুলারিনগুলো হিরে বা গ্রাফাইটের মতো অতিবৃহৎ অণু নয়। কোনো কোনো ফুলারিন অণুতে 60, 70 টি কার্বন পরমাণু থাকে। পাশে তোমাকে C_{60} অণুর গঠন দেখানো হলো। ইলেকট্রনিক্সে ও চিকিৎসাবিজ্ঞানে ফুলারিনদের অনেক ব্যবহার থাকতে পারে বলে এখন ফুলারিন নিয়ে অনেক গবেষণা চলছে। ছবিতে ● দিয়ে কার্বন পরমাণু বোঝানো হয়েছে।

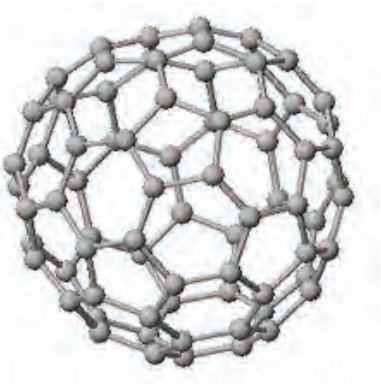

C_{60} ফুলারিন অণু

অনিয়তাকার রূপভেদ

কার্বনের অনিয়তাকার রূপভেদগুলোর নানান ব্যবহার আছে। কোক লাগে ধাতুনিষ্কাশনে আর জ্বালানি হিসেবে। চারকোল বা অঙ্গারের গুঁড়ো দিয়ে জল পরিশোধন করা যায়। চারকোল তার উপরিতলে অনেকরকম পদার্থের অণুকে ধরে রাখতে পারে। একে বলে অধিশোষণ ধর্ম।

একটা পরীক্ষা করো : চারকোলের অধিশোষণ ধর্ম

একটু কাঠকয়লা জোগাড় করে গুঁড়ো করে নাও। একটা মাঝারি শিশিতে অর্ধেক জল দিয়ে তাতে খানিকটা কালি বা রং গুলে নাও। এবার এর মধ্যে কাঠকয়লার গুঁড়ো ঢেলে ছিপি বন্ধ করে ভালো করে ঝাঁকাও। তারপর বেশ কিছুক্ষণ রেখে দাও। এবার মিশ্রণটিকে ফিলটার করো। ফিলটার করার আগে ও পরে কালি বা রঙের গাঢ়ত্বে কী কোনো তফাত দেখতে পাচ্ছ?

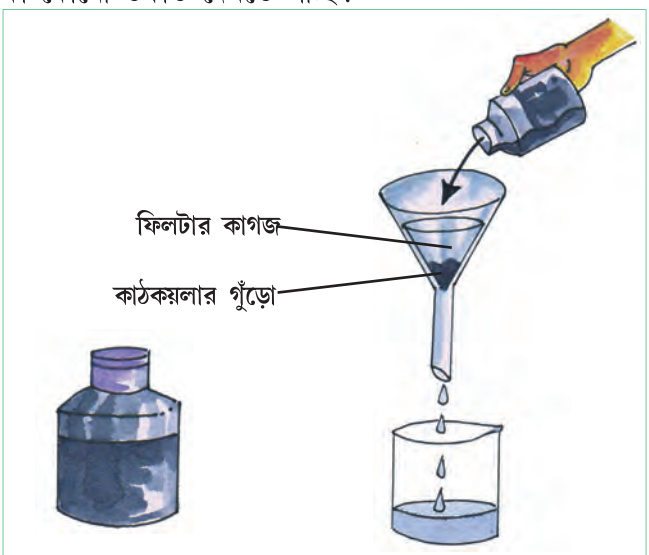

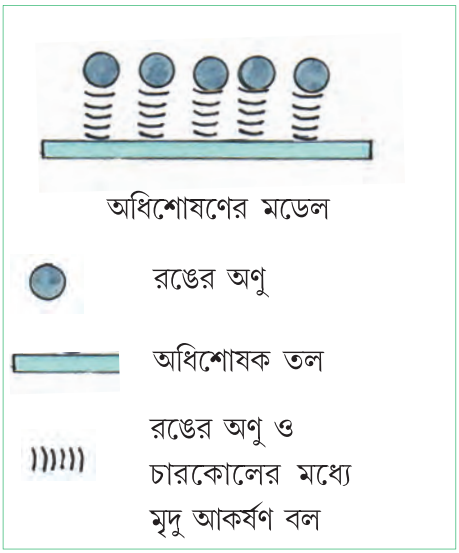

চারকোলের এই অধিশোষণের ধর্ম গ্যাস পরিশোধনে কাজে লাগানো হয়। বিশেষভাবে তৈরি চারকোল তার পৃষ্ঠতলে অনেক গ্যাস অণুকে ধরে রাখতে পারে। একে বলা হয় সক্রিয় চারকোল (Activated Charcoal)। বিষাক্ত গ্যাস থেকে বাঁচতে গ্যাস-মুখোশে সক্রিয় চারকোল ব্যবহৃত হয়। উদ্ভিজ্জ পদার্থ (কাঠ, চিনি, নারকোলের খোলা) বা প্রাণীজ পদার্থ (রক্ত, হাড়)— এসবকে অক্সিজেনের অনুপস্থিতিতে উত্তপ্ত করে চারকোল পাওয়া যায়। কার্বনের অন্য রূপভেদগুলোর মধ্যে ভুসোকালি অনেক সময় কাজল বা ছাপার কালি তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। গ্যাস কার্বন দিয়ে ব্যাটারির বা অন্য তড়িৎকোশের তড়িৎ দ্বার তৈরি করা হয়।

কার্বনের বহুরূপতা

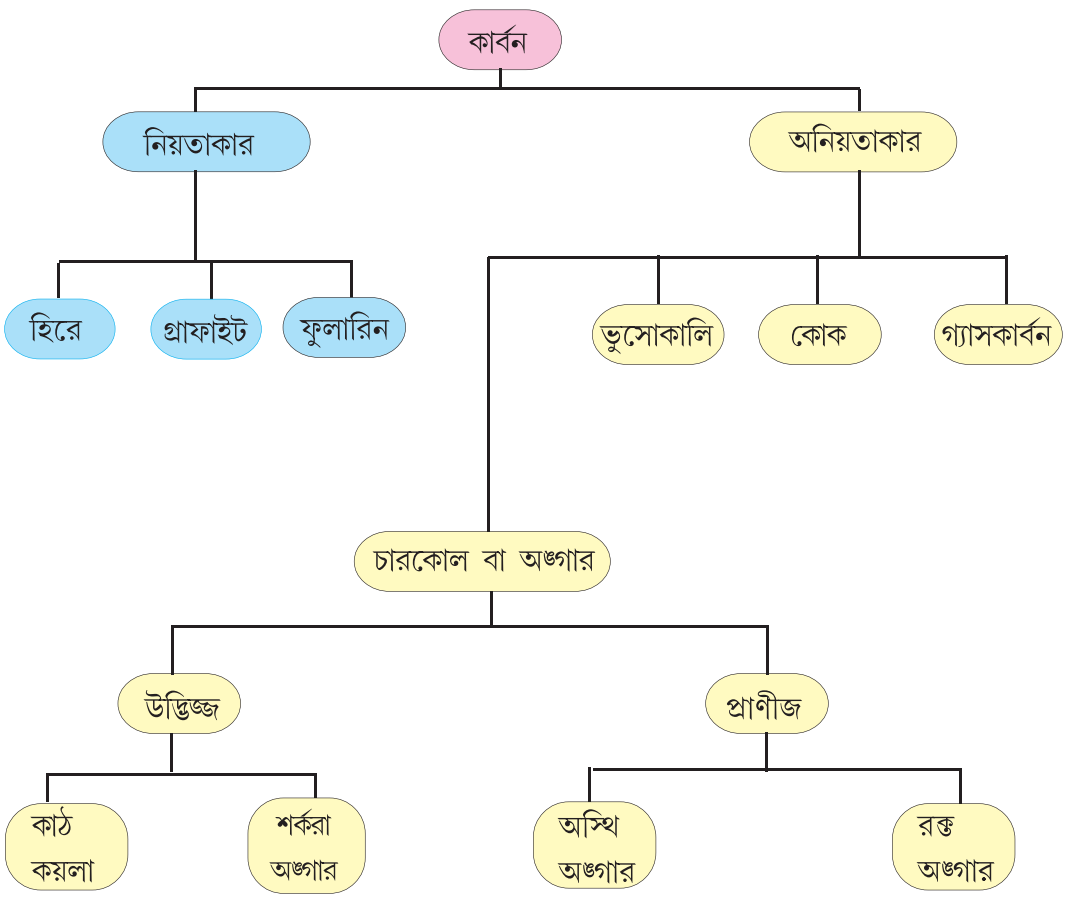

নিয়তাকার ও অনিয়তাকার এই শ্রেণিবিভাগ পদার্থগুলোর বাইরে থেকে দেখে যা মনে হয় তার ভিত্তিতে করা হয়। কার্বনের অনিয়তাকার রূপভেদগুলো প্রকৃতপক্ষে গ্রাফাইটেরই অতি ক্ষুদ্র ক্রিস্টালের সমষ্টি। সম্প্রতি গ্রাফিন(Graphene) বলে কার্বন পরমাণু দিয়ে গঠিত একরকম পদার্থের কথা জানা গেছে। ন্যানোপ্রযুক্তিতে (Nanotechnology) গ্রাফিনের নানান প্রয়োগ থাকতে পারে বলে গবেষণা চলছে।

জ্বালানি মূল্য বা ক্যালোরি মুল্য

ধরো তোমাকে একটা পাত্রে জল নিয়ে কাঠ, কয়লা ও রান্নার গ্যাস (LPG) ব্যবহার করে গরম করতে বলা হলো। কোন জ্বালানিটা তুমি ব্যবহার করবে?

এককথায় বলা তোমাদের পক্ষে একটু মুশকিল। কারণ এই জ্বালানিগুলো পুড়ে কতটা তাপ উৎপন্ন করতে পারে সে সম্বন্ধে তোমাদের কোনো ধারণা নেই। তোমাদের সুবিধার জন্য নীচে পরিচিত কয়েকটা জ্বালানি পুড়ে কতটা তাপ উৎপন্ন করতে পারে তার একটা তুলনামূলক লেখচিত্র দেওয়া হলো। এখানে তুলনা করা হয়েছে প্রত্যেকটা জ্বালানির 1 কেজি সম্পূর্ণ দহনের ফলে যে পরিমাণ তাপ (শক্তি) উৎপন্ন হয় তার মানগুলোর মধ্যে। একেই আমরা তাপন মূল্য বা ক্যালোরি মূল্য (Calorific value) বলে থাকি। একে কিলোক্যালোরি/কেজি (kcal / kg) এককে প্রকাশ করা হয়।

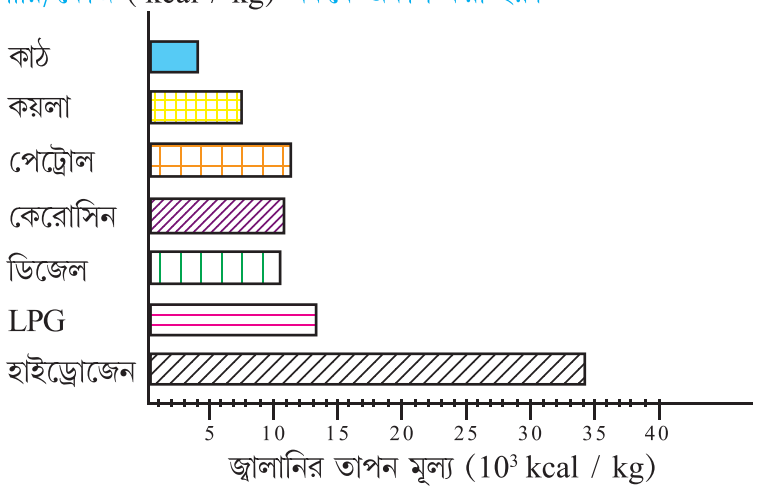

ওপরের চিত্রটা দেখে এখন তুমি বলতে পারবে কাঠ, কয়লা আর রান্নার গ্যাসের মধ্যে কোনটা ব্যবহার করা সবচেয়ে সুবিধাজনক? _____।

এর কারণ হলো তিনটে জ্বালানিই সমপরিমাণ পোড়ালে এদের মধ্যে রান্নার গ্যাস থেকেই সবচেয়ে বেশি তাপ পাওয়া যায়।

এ থেকেই বোঝা যাচ্ছে বিভিন্ন জ্বালানি বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করার সময় তার তাপন মূল্য জানা জরুরি। কারণ, একই জ্বালানি পুড়িয়ে সবরকম কাজ পাওয়া সম্ভব নয়। মহাকাশে একটা কৃত্রিম উপগ্রহ পাঠাতে রকেট লাগে। রকেটে যে প্রচণ্ড গতির সৃষ্টি করতে হয়, তার জন্যও জ্বালানি লাগে। ওপরের লেখচিত্রটা থেকে বলতে পারো কেন অন্য সব জ্বালানি বাদ দিয়ে রকেটে জ্বালানি হিসেবে তরল হাইড্রোজেন ব্যবহার করা হয়? _____।

জ্বালানি সংরক্ষণ

মানবসভ্যতার প্রথম সোপান বলতে যদি কিছু বোঝায় তবে তা হলো মানুষের আগুন জ্বালাতে শেখা। এই আগুনই প্রথম মানুষকে দিয়েছিল অন্ধকারে আলো, যাকে মানুষ গ্রহণ করে জ্ঞানের আলোরূপে। আগুন হলো শক্তির প্রতীক —তাপ ও আলোর ভাণ্ডার। আর তার উৎস হলো জ্বালানি।

আমরা নিজেদের নানা প্রয়োজনে তিন ধরনের জ্বালানি ব্যবহার করি— (i) কঠিন, (ii) তরল ও (iii) গ্যাসীয়।

আমাদের চেনা কয়েকটি জ্বালানির নাম নীচের সারণিতে দেওয়া হলো। তাদের কোনো ব্যবহার জানা থাকলে তা যোগ করো।

অবস্থা	জ্বালানির নাম	জ্বালানির ব্যবহার
কঠিন	কাঠ	রান্না করতে,
	কয়লা	রান্না করতে, বিদ্যুৎ উৎপন্ন করতে, ইট তৈরিতে
তরল	কেরোসিন	
	পেট্রোল	
	ডিজেল	
গ্যাসীয়	রান্নার গ্যাস (LPG)	
	সংনমিত প্রাকৃতিক গ্যাস (CNG)	গাড়ি চালাতে

দেখা যাচ্ছে জ্বালানি হিসাবে আমরা যে সমস্ত পদার্থের ব্যবহার করছি তাদের বেশিরভাগই খনিজ, আরো ভালোভাবে বলতে গেলে এগুলো হলো জীবাশ্ম জ্বালানি। খনিতে জ্বালানির পরিমাণ সীমিত, কিন্তু জনসংখ্যা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শক্তির চাহিদা ক্রমবর্ধমান । এর সঙ্গে আরো কারণ আছে— বেশি নগরায়ন ও আরো বেশি যন্ত্রনির্ভর সভ্যতা। এইভাবে জনসংখ্যা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শক্তির চাহিদা কীভাবে বেড়েছে?

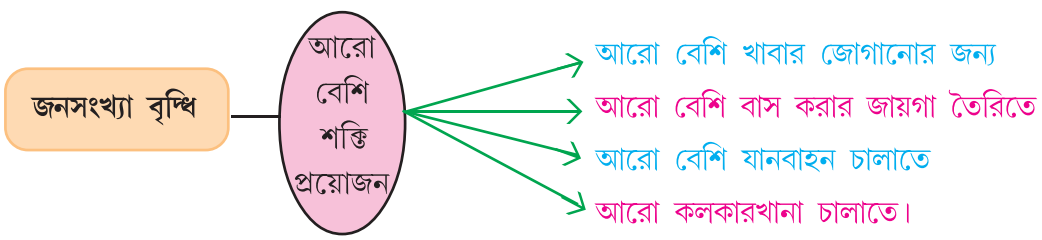

আর জ্বালানি থেকে যে শক্তি পাওয়া যায় তার ওপরে আরো বেশি করে নির্ভর করতে হচ্ছে এই চাহিদা মেটাতে । একটা হিসাবে দেখা গেছে আজ পর্যন্ত যে পরিমাণ জ্বালানি মানুষ পুড়িয়েছে তার মাত্র শতকরা 10 ভাগ পুড়িয়েছে 1900 সাল পর্যন্ত, আর গত শতাব্দীতে পুড়িয়েছে বাকি প্রায় 90 ভাগ। এর থেকেই পরিষ্কার হয়ে যায় বর্তমান মানব সভ্যতার জ্বালানি ক্ষুধা কতটা।

তাই এখন প্রশ্ন উঠেছে— এই বিপুল শক্তি জোগান দিয়েও কীভাবে অবশিষ্ট জ্বালানি দিয়ে আরও বেশি দিন চালানো যায়, অর্থাৎ জ্বালানি সংরক্ষণের। এই কাজটা করতে হলে কয়েকটা বিষয়ে নজর দিতে হবে।

(i) আমরা জানি, লক্ষ লক্ষ বছর আগের বিভিন্ন সময়ে মাটির তলায় চাপা পড়েছে উদ্ভিদদেহ। আর তা থেকেই তৈরি হয়েছে কয়লা, তার মধ্যে আছে কিছু উচ্চমানের (যাদের তাপন মূল্য বেশি), আবার অনেক নিম্নমানের কয়লাও আছে। কিন্তু ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তার দিকে লক্ষ দেওয়া হয়নি, ফলে অনেক উচ্চমানের কয়লাও ব্যবহার হয়েছে বিভিন্ন কম প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে, এমনকি রান্নার কাজেও। কিছু ক্ষেত্র আছে,

যেমন—তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র, যেখানে উচ্চমানের কয়লা জোগান দেওয়া খুবই দরকারি। এই ধরনের কাজের জন্যেই শুধুমাত্র উচ্চমানের কয়লার ভাণ্ডার সংরক্ষণ করা দরকার। প্রয়োজনে অন্য কোনো সমতুল্য জ্বালানি ব্যবহার করা যায় কিনা তাও দেখা প্রয়োজন।

তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে তাপ দিয়ে বয়লারে জল ফোটানো হয় আর তৈরি হওয়া গরম স্টিমের চাপে ঘোরে টারবাইনের চাকা। খারাপ মানের কয়লা থেকে কম তাপ তৈরি হয়। ফলে জল ফুটবে কম আর জলের মধ্যে থাকা অদ্রাব্য পদার্থ তাড়াতাড়ি থিতিয়ে পড়বে বয়লারের মধ্যে; তাতে বয়লারের ক্ষতি। আবার কম স্টিম তৈরি হলে বিদ্যুৎ উৎপাদনও কম।

(ii) কয়লাখনি অঞ্চলে দেখা যায় কয়লা খনি থেকে তোলা আর তা বিভিন্ন ব্যবস্থার মাধ্যমে নানা জায়গায় পাঠানোর সময় অনেক কয়লা নষ্ট হয়, গুঁড়ো হয়ে যায়। কখনও বা অসতর্কতার ফলে কয়লাখনি এলাকায় ভূগর্ভে আগুন ধরে যায়। এতেও নষ্ট হয় বড়ো এলাকার কয়লার ভাণ্ডার। তাই খনি এলাকায় আরো সতর্কভাবে কাজ করা উচিত।

কয়লা পরিশোধনের পদ্ধতিকে **coal-washing** বলে। এর ফলে কয়লার মধ্যে থাকা নানা অশুদ্ধি দূর করে কম ধোঁয়া ও কম ছাই উৎপাদনকারী কয়লা তৈরি করা হয়। ভারতে এখনও পর্যন্ত 17টা coal-washery আছে। 2013 সালের সেপ্টেম্বর মাসে আরো 16 টা স্থাপনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে ভারত সরকার।

(iii) কয়লা পরিশোধনের ক্ষেত্রে নিম্নমানের কয়লা থেকে উচ্চমানের কয়লা উৎপাদনের দিকে লক্ষ দিয়ে এই ধরনের কয়লাকে ব্যবহারযোগ্য করে তোলা হচ্ছে। এইভাবে যে সমস্ত কয়লার ব্যবহার সীমিত ছিল, তা আরো ব্যাপক ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যায়।

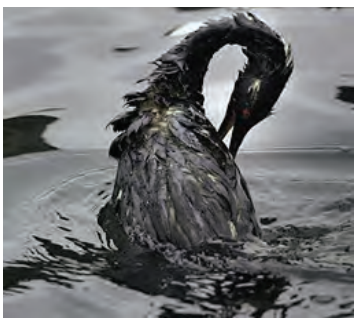

(iv) পেট্রোলিয়ামজাত জ্বালানি তেল পরিবহণের একটা কম খরচের ও বড়ো মাধ্যমই হলো জলপথে পরিবহণ। কিন্তু অনেক সময়ই অসতর্কতার ফলে নদী, সমুদ্রে তেল ছড়িয়ে পড়তে দেখা যায়। এর ফলে একদিকে যেমন বহুমূল্য জ্বালানির অপচয় হয় তেমনি ক্ষতি হয় জলে বসবাসকারী জীবজগতের। এরকম ঘটনার কথা তোমরা সংবাদপত্রে বা টেলিভিশনে দেখে থাকবে, এই বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি দিলে অনেকটাই ক্ষতি এড়ানো যায়।

(v) উপযুক্ত পদ্ধতিতে কয়লা (বিশেষত নিম্নমানের কয়লা) ও খনিজ তেল থেকে অন্যান্য আরো ভালো জ্বালানি তৈরি করা যেতে পারে, যারা একইসঙ্গে দূষণও কম করবে। এভাবেও মূল জীবাশ্ম জ্বালানি সঞ্চয়ের আয়ু দীর্ঘায়িত করার চেষ্টা হচ্ছে।

(vi) প্রাকৃতিক গ্যাসের উৎস থেকে বেরিয়ে আসা গ্যাস নষ্ট হতে না দিয়ে তার সংরক্ষণ ও প্রয়োজনমতো ব্যবহারে এই ধরনের জ্বালানির অপচয় বন্ধ হতে পারে।

(vii) জ্বালানিবিহীন যানবাহন, যেমন—জলপথে যন্ত্রবিহীন নৌকো বা স্থলপথে সাইকেল , ইত্যাদির ব্যবহার বাড়ালেও জ্বালানির সাশ্রয় সম্ভব। এবিষয়ে — নিউজিল্যান্ড বা আমাদের প্রতিবেশী দেশ চিনে সাইকেল ব্যবহারের উদাহরণ উল্লেখযোগ্য।

(viii) ব্যক্তিগত যানবাহন ব্যবহার না করে যথাসম্ভব গণপরিবহণ ব্যবস্থার সাহায্য নিলেও কিছুটা হলেও জ্বালানির সাশ্রয় হতে পারে।

বিকল্প জ্বালানি

এছাড়াও বহুব্যবহৃত জ্বালানিগুলোর বিকল্প হিসাবে অন্যান্য শক্তি উৎসের কথা ভাবা যেতে পারে। যেমন— (i) সৌরশক্তি, (ii) বায়ুশক্তি, (iii) ভূ-তাপ শক্তি, (iv) জোয়ারভাটার শক্তি,(v) জৈব উৎস থেকে প্রাপ্ত জ্বালানি, (vi) পারমাণবিক শক্তি।

শক্তির কয়েকটা বিকল্প উৎস সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক—

(i) সৌরশক্তি :

সৌরতাপ ও আলো দক্ষভাবে সংগ্রহ করে কাজে লাগানো যায়। সৌরতাপের সাহায্যে বয়লার চালিয়ে তা থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন সম্ভব। বড়ো মাপের আয়না (দর্পণ) ব্যবহার করে বৃহৎ সৌরচুল্লি তৈরি করে তা থেকে উচ্চ উষ্ণতা পাওয়া সম্ভব। সৌর উনুন গ্রীষ্মপ্রধান দেশে লাভজনক হলেও পুরোপুরি গ্রহণযোগ্য হয়নি। কারণ সৌরশক্তি ব্যবহারের মূল প্রতিবন্ধকতা হলো জলবিদ্যুতের মতো সৌরবিদ্যুতেও প্রাথমিক যন্ত্রাদি স্থাপন ও পরিচালন ব্যয় বেশি, প্রায় সমতুল্য। তাই ব্যয় কমিয়ে সৌরশক্তির ব্যবহার বর্তমান শতাব্দীতে একটা মুখ্য ভূমিকা নেবে, এমন আশা করা যেতেই পারে। বর্তমানে সৌরশক্তির ব্যবহার ক্রমবর্ধমান।

(ii) বায়ুশক্তি :

সূর্যের তাপের প্রভাবে এক জায়গার বাতাস অন্য জায়গায় বয়ে যায়। তৈরি হয় বায়ুপ্রবাহ—এটা আমরা জানি। বয়ে যাওয়া বাতাসেরও গতিশক্তি আছে। এই শক্তি কাজে লাগিয়ে যদি বড়ো পাখা লাগানো টারবাইনের চাকা ঘোরানো যায় তাহলেই বিদ্যুৎশক্তি তৈরি হবে। তার জন্যে কোনো প্রচলিত শক্তি ব্যবহারের প্রয়োজন নেই। আমাদের রাজ্যের ফ্রেজারগঞ্জে গেলে দেখতে পাবে কেমনভাবে সমুদ্রের ধারের জোর হাওয়া কাজে লাগিয়ে ঘোরানো হচ্ছে বায়ুকল।

(iii) ভূ-তাপ শক্তি :

আমাদের রাজ্যের বক্রেশ্বরের নাম শুনেছ? সেখানে কী আছে বলোতো? — গরম জলের কুণ্ড, যাকে উষ্ণপ্রস্রবণ বলা হয়। ভারতের আরো কোথায় এমন আছে? — ওড়িশার তপ্তপানি, হিমাচল প্রদেশের মণিকরণ, গুজরাতের তুয়া ইত্যাদি। এই সমস্ত জায়গায় গেলে দেখা যাবে ছোটো পুকুরের মতো জায়গায় জল সবসময়েই গরম হয়ে আছে, আর তা থেকে জলের বাষ্প উঠছে। কীভাবে এই জল গরম হলো? — আমরা তো জানি যে মাটির তলায় পৃথিবীর ভেতরটা এখনও গরম। কতটা গরম? পৃথিবীর কেন্দ্রের উষ্ণতা প্রায় 6000°C । আর আগ্নেয়গিরিতে যে গলিত ম্যাগমা বেরোতে দেখা যায় তা খুবই কম একটা অংশ, বেশিরভাগটাই ভূপৃষ্ঠের 5 থেকে 20 কিমি গভীরে থেকে যায়। যখন এই গলিত শিলা ঠান্ডা হয়ে তরল থেকে কঠিন অবস্থা পেতে শুরু করে, তখন প্রচুর পরিমাণ তাপ ছেড়ে দেয়। আর তার কাছের শিলাস্তর তখন গরম হয়ে যায়। প্রকৃতির খেয়ালে

মাটির তলার জলের স্তর যখন গরম পাথরের স্তরের কাছাকাছি এসে যায় তখন তাও গরম হয়ে যায়। এইভাবেই ভূ-তাপ শক্তির বহিঃপ্রকাশ দেখা যায়। এত অফুরন্ত সেই শক্তির ভাণ্ডার, তা আমরা এখনও সেভাবে কাজেই লাগাতে পারিনি। মাটিতে নল ঢুকিয়ে এই গরম জল থেকে পাওয়া স্টিম দিয়ে সরাসরি টারবাইনের চাকা ঘুরিয়ে তৈরি করা যায় বিদ্যুৎ। যদি তা সম্ভব না হয়,তবে নল দিয়ে ঠান্ডা জল মাটির গভীরে ঢুকিয়ে, গরম করে আনা যায় বাইরে। শক্তির জোগান দেবে পৃথিবীর ভেতরের তাপ।

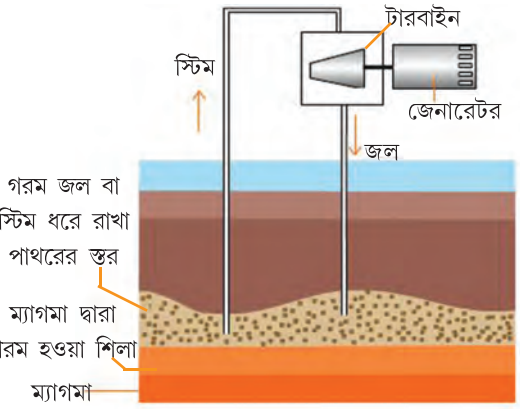

(iv) জোয়ারভাটার শক্তি :

সারাদিনের বিভিন্ন সময়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দু-বার করে জোয়ারভাটা আসে। আর তা স্রোতের মতো বয়ে নিয়ে যায় নদী-সমুদ্রের জলকে। বায়ুশক্তিকে কাজে লাগাতে গেলে যেমন সূর্যের কিরণ বা সূর্যালোক থেকে বায়ুস্তর গরম হওয়া ও তার ফলে বায়ুস্রোত তৈরি হওয়া জরুরি, এখানে কিন্তু সেই অসুবিধা নেই। কেন বলো তো?—কারণ, জোয়ারভাটা দিনে দু-বার করে হবেই, আর সেইসঙ্গে জলের স্রোত তৈরি হবেই। এই স্রোতের গতিশক্তির সাহায্যে টারবাইন ঘুরিয়ে তৈরি করা যায় বিদ্যুৎ। তাই জোয়ারভাটার শক্তি জলবিদ্যুতেরই অন্য একটা রূপ। আবার সমআয়তনের বাতাসের চেয়ে জল বহুগুণ ভারী, তাই জলস্রোত দিয়ে ঘনভাবে রাখা ব্লেডযুক্ত টারবাইনের চাকা অনেক জোরে ঘোরানো যায়। এভাবে বায়ুকলের থেকে এটা অনেক কার্যকর হতে পারে বিদ্যুৎ উৎপাদনে। যেহেতু এই শক্তি ব্যবহারের আগে কোনো পূর্ববর্তী শক্তি (back-up energy) ব্যবহারের দরকার নেই, সেজন্য আমাদের মতো নদীমাতৃক ও তিনদিক সমুদ্র দিয়ে ঘেরা দেশের সম্ভাবনা প্রচুর।

(v) জৈব উৎস থেকে প্রাপ্ত জ্বালানি

a. জৈব দাহ্যপদার্থ (বায়োমাস) :

কাঠ-পাতা, আখের ছিবড়ে, ধানের তুষ ইত্যাদি বহু প্রাচীনকাল থেকেই বাড়ির জ্বালানি হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। কিছু কিছু শিল্পপ্রক্রিয়াতেও এই ধরনের বর্জ্য জ্বালানি হিসাবে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু এই জ্বালানির মূল অসুবিধা হলো এদের দহনজনিত দূষণ। কিন্তু ইদানীং এই দূষণ কমিয়ে বর্জ্য দাহ্যপদার্থ থেকে শক্তি আহরণে নিত্যনতুন উদ্ভাবন ঘটে চলেছে।

b. জৈব গ্যাস :

জৈব আবর্জনা বাতাসের অনুপস্থিতিতে জীর্ণকরণ (digestion) করে পাওয়া গ্যাসকে জৈব বা বায়োগ্যাস বলা হয়। এটা সম্পূর্ণ জ্বালানি হিসাবে ব্যবহৃত হয়। এই অবায়বীয় জীর্ণকরণ প্রক্রিয়ায় মূলত মিথেন (CH_4) উৎপন্ন হয় বলে ঘটনাকে জৈব মিথেন উৎপাদন (biological methane production) নামে অভিহিত করা হয়। গার্হস্থ্য, শিল্পজাত ও কৃষিজাত জৈব আবর্জনা এই কাজে ব্যবহার করা হয়।